সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০১০

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতি

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র
২/১৯, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৪৫৬০০; ফ্যাক্স: ৯১৩৯৭৯০
ই-মেইল: info@supro.org
ওয়েবসাইট: www.supro.org

সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০১০
সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতি

গবেষণা, সংকলন ও সম্পাদনা
সারা জামান
মোহাম্মদ আরিফ রব্বানী
মৌসুমী বিশ্বাস
কাজী শফিকুর রহমান
মামুন কাজী

সহযোগিতা
মোঃ শরিফুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১১

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৪৩৯২-৫

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ
অর্ক

প্রকাশক
সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র
২/১৯, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর,
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৯১৪৫৬০০; ফ্যাক্স: ৯১৩৯৭৯০
ই-মেইল: info@supro.org
ওয়েবসাইট: www.supro.org

মূল্য: ২৫০ টাকা

আর্থিক সহযোগিতা: অক্সফাম নভিব

Social Audit Report 2010
Findings of Govt. Primary Education and Health Service

Research, Compilation & Editing
Sara Zaman
Mohammad Arif Robbani
Mousumi Biswas
Kazi Shafiqur Rahman
Mamun Kazi

Cooperation by
Md. Shariful Islam

Published in
December 2011

I**SBN:** 978-984-33-4392-5

Design and Printed by
ARKA

Published by
Sushasoner Jonny Procharavizan-SUPRO
2/19 Block- B, Babor Road
Mohammadpur, Dhaka-1207
Phone : +88029145600
Fax: +88029139790
E-mail : info@supro.org
Web: www.supro.org

Price: Tk. 250.00

Financial Supported by: Oxfam Novib

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতির ওপর পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০১০ প্রকাশিত হচ্ছে। এই সামাজিক নিরীক্ষাকর্মের সফল সম্পাদনের জন্য তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রতিবেদন প্রণয়ন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই সংশ্লিষ্টদের নিরন্তর প্রচেষ্টারত থাকতে হয়েছে। অনেকের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে কাজটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সুপ্র'র সম্মানিত নির্বাহী ও জাতীয় পরিষদ সদস্যসহ জেলা সম্পাদকবৃন্দকে যাদের সার্বক্ষণিক তদারকিতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এবং জেলা ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জেলা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রতি যারা এই নিরীক্ষা কাজটির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থেকে সহায়তা করেছেন। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য আহরন এবং জেলা প্রতিবেদন প্রণয়নে সুপ্র'র জলা ক্যাম্পেইন সহায়কগণ প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি যারা শত ব্যস্ততার মাঝেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, অন্তঃবিভাগ ও বহিঃবিভাগের রোগীদের প্রতি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অধ্যক্ষ শাহ আলম, সংসদ সদস্য এবং মাননীয় সদস্য শিক্ষা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অ্যাডভোকেট খান টিপু সুলতান, সংসদ সদস্য ও মাননীয় সদস্য, সংসদ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, আব্দুল মান্নান, সাবেক বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী, নিলোফার চৌধুরী মনি-মাননীয় সংসদ সদস্য যারা মতবিনিময় সভায় উপস্থিত থেকে নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি পড়েছেন এবং তৃণমূল মানুষের সুপারিশসমূহ অবগত হয়ে সরকারি গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করেছেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি জাতীয় পরিষদ সদস্য ও কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যবৃন্দকে যাদের নেতৃত্ব ও নির্দেশনামূলক সিদ্ধান্ত আমাদের সকল কাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের জন্য ধারণাপত্র ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন, সম্পাদনা ও সমন্বয়ের কাজে সুপ্র'র যেসব সহকর্মী এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বাস্তবায়ন করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০১০ প্রকাশের কাজটি যত্নসহকারে করতে চেষ্টা করেছি। তথাপি ভুল-ত্রুটি থাকা বিচিত্র কিছু নয়। যতটুকু ভুল রয়েছে আগামীতে তা যথার্থভাবে সংশোধন করে নেয়ার প্রচেষ্টা থাকবে।

ধন্যবাদসহ

উমা চৌধুরী
পরিচালক
সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র

টেবিল ও চার্টের তালিকা

টেবিল: ২.১ সেবা দেয়ার জন্য নার্সদের পদসংখ্যা যথেষ্ট কিনা
টেবিল: ২.২ হাসপাতালে নার্সদের আবাসন ব্যবস্থা
টেবিল ২.৩ নার্সদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কিনা
টেবিল ২.৪ জেলা সদর হাসপাতালে অবকাঠামো ও চিকিৎসা উপকরণ
টেবিল ২.৫ হাসপাতালের প্রয়োজনীয় ডায়াগনসিস সুবিধা
টেবিল ২.৬ জেলা সদর হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা সরঞ্জামাদি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য
টেবিল ২.৭ হাসপাতালের বহিঃবিভাগের রোগী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য
টেবিল ২.৮ হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের রোগী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য (জেলা সদর হাসপাতাল)
টেবিল ২.৯ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের স্বাস্থ্যসেবা
টেবিল ২.১০ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা
টেবিল ২.১১ কমিউনিটি ক্লিনিকে কমিউনিটি গ্রুপের মাসিক সভা সংক্রান্ত তথ্য
টেবিল ২.১২ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সেবা সম্পর্কে স্থানীয় প্রতিনিধি প্রদত্ত তথ্য
টেবিল ২.১৩ কমিউনিটি ক্লিনিকে সাপ্তাহিক সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য
টেবিল ২.১৪ হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য
টেবিল ২.১৫ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঔষধের সংস্থান
টেবিল ২.১৬ হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের রোগী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য
টেবিল ২.১৭ জেলা সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য
টেবিল ২.১৮ হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের রোগী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য
টেবিল ২.১৯ ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত অভিমত
টেবিল ৩.১ শিক্ষার্থী ভর্তি সম্পর্কে শিক্ষদের অভিমত
টেবিল ৩.২ শিক্ষার্থী ভর্তি সম্পর্কে নাগরিক সমাজের অভিমত
টেবিল ৩.৩ ২০ জেলায় শূন্য পদে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার সংখ্যা
টেবিল ৩.৪ অতিরিক্ত কাজ পাঠদানে ব্যাহত করে কি না?
টেবিল ৩.৫ নারী ও পুরুষ শিক্ষকদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে কিনা
টেবিল ৩.৬ ভৌত অবকাঠামো

চার্ট ২ক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজীয় জনবলের যথেষ্টতা
চার্ট ২খ ডাক্তারদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা আছে কিনা
চার্ট ২গ থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যা অনুযায়ী পর্যাপ্ত উপকরণ ও জনবল
চার্ট ২ঘ থানা হাসপাতালে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি
চার্ট ২ঙ থানা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ
চার্ট ২চ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা
চার্ট ২ছ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা
চার্ট ২জ হাসপাতালে সেবার পর্যাপ্ততা
চার্ট ২ঝ রোগীদের অতিরিক্ত ফি দিতে হয় কিনা
চার্ট ২ঞ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রদত্ত সেবার পর্যাপ্ততা
চার্ট ২ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অন্তঃবিভাগের রোগী থেকে প্রাপ্ত সেবা
চার্ট ২ঠ ইউনিয়ন হাসপাতালে সেবা পাওয়ার জন্য কোনও ফি দিতে হয় কিনা

চার্ট ২ড স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে স্থানীয় সরকারের তদারকি
চার্ট ২ঢ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র মনিটরিং এ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ভূমিকা
চার্ট ২ণ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণে সুপারিশ
চার্ট ২ত হাসপাতাল থেকে ঔষধ সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্য
চার্ট ২থ স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী ঔষধ পর্যাপ্ত কিনা
চার্ট ২দ হাসপাতালে ডায়াগনসিস অবস্থা
চার্ট ২ধ বাজেট বরাদ্দ যথেষ্ট কিনা
চার্ট ২ন হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের রোগী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য
চার্ট ২প হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের রোগী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য
চার্ট ২ফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দালালদের উপদ্রব
চার্ট ৩ক বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ
চার্ট ৩খ ভর্তি ও সমাপনী
চার্ট ৩গ শিক্ষার্থী অনুসারে বই বিতরণ
চার্ট ৩ঘ পাঠ্যবই চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল কিনা
চার্ট ৩ঙ বই পরিবহন বাবদ ব্যয়
চার্ট ৩চ সপ্তাহে শিক্ষকপ্রতি ক্লাস নেয়ার সংখ্যা
চার্ট ৩ছ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক
চার্ট ৩জ ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা
চার্ট ৩ঝ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য হিসেবে ক্রয় কমিটিতে আছে কিনা
চার্ট ৩ঞ অবকাঠামো
চার্ট ৩ট বিদ্যালয়ে শৌচাগারের অবস্থা
চার্ট ৩ঠ শৌচাগার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী কিনা?

প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তাসার

দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের যে সমস্ত সেবাসমূহ জনগণের পাওয়ার কথা ছিল সেগুলো সঠিকভাবে পেয়েছে কিনা, পেলে সেগুলোর গুণগত মান কেমন ছিল, প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান- সুপ্র ২০ (বিশ) জেলায় সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করেছে।

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে সাংবিধানিকভাবে ও আন্তর্জাতিকভাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিকে মানুষের সার্বিক সক্ষমতার জন্য অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেয়া হয়েছে। মানব উন্নয়নের সূচক হিসেবে অত্যাবশ্যকীয় এ খাত দুটোর বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকার অগ্রাধিকারের কথা বলে থাকে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে দেখা যায় দরিদ্র, প্রান্তিক জনগণ এখনো শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিরাজমান নানা সমস্যার ফলে দরিদ্র, প্রান্তিক এবং তৃণমূলের জনগণ সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুপ্র পরিচালিত সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ওপর পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় স্বাস্থ্যখাতে বিরাজমান সমস্যাগুলোর মধ্যে জনবল সংকট, চিকিৎসা সেবার জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি এবং উপকরণের অভাব, অবকাঠামোর অভাব, আঞ্চলিক বৈষম্য, অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ এবং সর্বোপরি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ব্যবস্থাপনার সংকট রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে জনবল সংকট, মানসম্মত শিক্ষার অভাব, ঝরে পড়া, গ্রাম ও শহরের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান, শিক্ষার পণ্যায়ন, বেসরকারিকরণ ও শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের অভাব ইত্যাদি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অধ্যায় এক-এ সামাজিক নিরীক্ষার প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষা কী ও কেন, সামাজিক নিরীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্য, সামাজিক নিরীক্ষা কাজের সীমাবদ্ধতাসমূহ/চ্যালেঞ্জ, সামাজিক নিরীক্ষায় অনুসৃত পদ্ধতিগত দিক, নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ভৌগোলিক এলাকা, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই এ নিরীক্ষালব্ধ ফলাফলের আলোকে স্বাস্থ্যসেবা চিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে জনবল, আবাসন ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ, চিকিৎসা সেবার মান ও ফি, সরবরাহকৃত ঔষধ ও খাবার, ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ানদের দক্ষতা ও সেবা, বরাদ্দকৃত বাজেট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সার্বিক পরিবেশ, সেবা গ্রহীতাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত এবং সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, জেলা সদর, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতালের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য পরিমিত জনবল থাকা জরুরি কিন্তু নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে জনবল আছে তা যথেষ্ট না। একদিকে পদসংখ্যা কম এবং অন্যদিকে ছুটিতে ও প্রেষণে থাকার জন্য থাকার জন্য জনবলের আরও ঘাটতি তৈরি হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবার মান বাড়ানোর জন্য প্রতিটি পর্যায়ে আবাসন সুবিধা থাকা দরকার। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিটি স্তরের ডাক্তারদের জন্য আবাসন সুবিধা থাকলেও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য আবাসন সুবিধা নেই। তাছাড়া উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের আবাসন ব্যবস্থা মোটেই বসবাসের উপযোগী নয়। সংশ্লিষ্টদের মতে, ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বসবাসের উপযোগী আবাসন ব্যবস্থা করলে গ্রামে ডাক্তারদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া প্রতিটি পর্যায়ের হাসপাতালে অবকাঠামো ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব রয়েছে যা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ।

আধুনিক যন্ত্রপাতি চালানোর মতো দক্ষ জনবলেরও অভাব রয়েছে। নার্সদের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ জরুরি হলেও প্রশিক্ষণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। বিরাজমান নানাবিধ সমস্যা সমাধানেরমাধ্যমে চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ থাকা দরকার সেটি না থাকায় এই সমস্যা আরও প্রকট হচ্ছে যার ফলাফল ভোগ করছে সাধারণ মানুষ। সাধারণ রোগীরা স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নয়। তারা বাধ্য হয়ে সরকারি হাসপাতালে আসে। সাধারণ সীমিত আয়ের জনগণের পক্ষে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সেবা নেয়া সম্ভব নয়। দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য চিকিৎসা সেবার মান বাড়ানোর জন্য যে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় তা পর্যাপ্ত নয়। স্বাস্থ্যখাতে বিরাজমান উল্লেখিত সমস্যাগুলোর পাশাপাশি রয়েছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ব্যবস্থাপনার চরম সংকট। ব্যবস্থাপনা সংকটে রয়েছে কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র, সিদ্ধান্তগ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা, হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সদের অনুপস্থিতি, হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় ফি নেয়া ইত্যাদি। অকার্যকর রয়েছে হাসপাতাল উপদেষ্টা কমিটি, সমাজকল্যাণ তহবিলের অব্যবস্থাপনা, চিকিৎসক ও নার্সদের দায়িত্বে অবহেলা। এসব সমস্যা সমাধানে হাসপাতালে বিনামূলে কী কী সেবা পেতে পারে সে সম্পর্কে জনগণকে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবার আধুনিকায়ন ও ডাটাবেইজ তৈরি প্রয়োজন এবং সকল জনগণের জন্য স্বাস্থ্যকার্ড প্রচলনের উদ্যোগ নিতে হবে।

অধ্যায় তিন এ শিক্ষা সম্পর্কিত সামাজিক নিরীক্ষালব্ধ প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ২০১০-১১ সাথে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত বাজেট তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে কী প্রভাব বিস্তার করছে এবয় শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং এ বিষয়ে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও নাগরিক প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সুপারিশ তুলে আনা হয়েছে। এই অধ্যায়ে স্কুল পর্যায়ে বাজেট বরাদ্দের প্রক্রিয়া ও পরিমাণ, ভর্তি ও সমাপনী, বিনা মূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকদের অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির ভূমিকা, অবকাঠামো, উপবৃত্তি , মিড-ডে মিল, জনবল, সুপারিশসমূহ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের মূল ভূমিকা পালন করে। দেখা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৭৫ শতাংশেরও বেশি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সকল বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরের প্রায় ৮৩% শিশু ভর্তি হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ে ৪৫.৫% এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যয় হয়। সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে টাকা বরাদ্দ দিয়েছে তা এমডিজির লক্ষ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ঠ নয়।

সরকার ২০১৫ সালকে সামনে রেখে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ এর আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-২) এ শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ এ প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি কর্মকৌশলেও ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ কৌশলসমূহ যথাক্রমে শিক্ষক নিয়োগ ও তার প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকদের পেশাদারিত্ব মান নিশ্চিতকরণ, স্কুলের সঙ্গে কমিউনিটির ও স্থানীয় সরকারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলা। মানসম্মত শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং বছর বছর এর জন্য বাজেট ব্যয় হলেও আশানুরূপভাবে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পায় নি বলে মনে করেন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। স্কুলে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি পূর্বের চেয়ে বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষার গুণগত মান। শিক্ষার্থীরা ক্লাসের পড়া ঠিকমতো বুঝতে পারে না। ফলে তাদের নোট বই কিনে দিতে হয় এবং বাড়িতে গৃহ শিক্ষক দিতে হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা পড়া-শুনার প্রচুর চাপ অনুভব করে ও ক্লাসের পড়া ক্লাসে শেষ করতে পারে না। আনন্দহীন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক চর্চার অভাব, শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত, খেলা ধুলার সামগ্রী না থাকা সর্বোপরি ক্যারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণ না থাকা এগুলো প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের ক্ষেত্রে বড় বাধা তারা মনে করেন।

নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও অভিভাবকগণ অভিমত প্রকাশ করেন, মানসম্মত শিক্ষার আরেকটি বড় বাঁধা হলো মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ না দেয়া। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপের ফলে অনেক

ক্ষেত্রেই দলীয় বিবেচনায় এবং অর্থের বিনিময়ে অনুপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হচ্ছে। যাতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান।

এখনো বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী সকল শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। চর, হাওর ও পার্বত্য অঞ্চলে ক্যাচমেন্ট এরিয়ার কাছাকাছি স্কুল না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার একই ক্যাচমেন্ট এরিয়ার মধ্যে একাধিক বিদ্যালয় (সরকারি, রেজিস্টার্ড, এবতেদায়ী. এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়) থাকায় দেখা যায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হ্রাস পাচ্ছে। বিদ্যালয়ে না যাওয়ার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য, অভিভাবকদের অসচেতনতা, দারিদ্র্য ও অসচেতনতা উভয়ই, দূরবর্তী স্কুল, স্কুলে যেতে শিক্ষার্থীদের অনীহা এবং কিছু সংখ্যক উত্তরদাতা বাল্যবিবাহকেও দায়ী করেন।

গুণগত শিক্ষার জন্য দরকার পর্যাপ্ত জনবল। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, ২০টি জেলায় শিক্ষকের পদ রয়েছে ১,১২,২৮৫ জন। এর মধ্যে কর্মরত আছে ১,০৪,৫৮০ জন এবং শূন্য পদ রয়েছে ৭৭০৫ জন। মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য দরকার প্রশিক্ষিত শিক্ষক। ৮০টি স্কুলে পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষার পরিচালিত জরিপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের সকলেই পিটিআই থেকে সিইনএড প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে একজন শিক্ষককে ক্লাসে পাঠদানে যে সময় দিতে হয় তা তারা দিতে পারেন না। শিক্ষকদের ক্লাসের জন্য যে সময় বরাদ্দ থাকে অনেক সময় হাজিরা ডাকতেই অর্ধেক সময় চলে যায়। এর ফলে সবার প্রতি মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা প্রদান সম্ভব হয় না।

সরকারি ক্যারিকুলাম অনুযায়ী যেভাবে ক্লাসে শিক্ষা প্রদান করার কথা তাতে একটি ক্লাস নিলে একজন শিক্ষককে একটি ক্লাস বিরতি নিতে হয়। কিন্তু শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষকদের বিরতিহীন ক্লাস নিতে হয়। শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী, মানসম্মন্ন শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের সাপ্তাহিক কার্য ঘণ্টা ৩৬ ঘণ্টা। এরমধ্যে পাঠদান ১৮ ঘণ্টা, শিক্ষার্থী পরিচালনা ও সংশোধন ৬ ঘণ্টা, অনুশীলনী তৈরি ৮ ঘণ্টা এবং অন্যান্য কাজ ৪ ঘণ্টা। সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী নীতিমালা অনুযায়ী কোনও শিক্ষকই নীতিমালা অনুযায়ী পাঠদান করতে পারে না। সাক্ষাতকারে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের সকলেই পিটিআই থেকে সিইনএড প্রশিক্ষণ পেলেও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অনেকেই পায় নি। নিরীক্ষার তথ্যানুযায়ী, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভাবে ইংরেজি, গণিত বিষয়ে শিক্ষাদান করার মতো মানসম্মত শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে।

পাঠদান ছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয় যার ফলে তাদের পাঠদানে মনোসংযোগ ব্যাহত হয়।

বিদ্যালয় পরিচালনা এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির (এসএমসি) ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের সকল সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া যেমন: ক্রয় সম্পর্কিত বিষয়াদি, উপবৃত্তি, ক্রিড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক মিলাদ, ভর্তি, ফলাফল, দান-অনুদান প্রাপ্তি, মেরামত ও নির্মাণ, কোচিং ইত্যাদি বিষয়গুলোতে ম্যানেজিং কমিটি ভূমিকা এবং প্রভাব দুটোই থাকার কথা থাকলেও এসএমসির কার্যকর ভূমিকার অভাব রয়েছে।

গুণগত শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো থাকা দরকার। নিরীক্ষার তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, ৮৭% বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য টিউবওয়েলের ব্যবস্থা আছে। ১৩% বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য টিউবওয়েল নেই। মাত্র ৪৭% বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে, ৩২% বিদ্যালয়ের শৌচাগারের অবস্থা মোটামুটি স্বাস্থ্যসম্মত এবং ১৬% বিদ্যালয়ে শৌচাগারের অবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এরমধ্যে ৫% বিদ্যালয়ে শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। গ্রামাঞ্চলের শৌচাগারগুলোতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকার জন্য এগুলো ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়।

আবার বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের শৌচাগার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী নয়। বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। বিদ্যালয়গুলোতে নেই প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।

নিরীক্ষাভুক্ত এলাকায় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, অভিভাবক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, উপবৃত্তি কার্যক্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি বাড়ালেও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারে নি। উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তের ফলে দরিদ্র শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই শর্তগুলো পূরণ করতে পারে না। দেখা যায় দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের পারিবারিক নানা ছোট-খাট কাজ করতে হয়, টুকটাক উপার্জনও করতে হয়। যার ফলে উপস্থিতির শর্ত পূরণে সে ব্যর্থ হয়।

নিরীক্ষার আওতাভুক্ত কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে স্কুল মিল প্রকল্পটি চালু নেই। কিন্তু তারপরও অনেক শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, অভিভাবক এর প্রয়োজন অবশ্যই আছে বলে মনে করেন। তবে মিড-ডে মিল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করা উচিত হবে না বলে তারা মনে করেন।

নিরীক্ষার আওতাভুক্ত কোনো বিদ্যালয়েই ৪র্থ শ্রেণির কর্মী এমনকি কোনো পরিচ্ছন্নতা কর্মী নেই। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মী বা পরিচ্ছন্নতা কর্মীর অভাবে স্কুলগুলো অস্বাস্থ্যকর হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। বিশেষ করে শৌচাগার, শ্রেণী কক্ষ, মাঠ, খাবার পানি ইত্যাদি নেংরা ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এছাড়া উল্লেখিত ২০টি জেলায় ৭,৭০৫ জন শিক্ষকের এবং ২৪৪টি শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে। জেলার শিক্ষকদের মোট শূন্য পদ পূরণ করার পরও জেলায় মোট সৃষ্টপদের কমপক্ষে বাড়তি এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ সৃষ্টি প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। একইভাবে উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসে যে জনবল কাঠামো রয়েছে তা একেবারেই অপ্রতুল।

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৩
টেবিল ও চার্টের তালিকা ৪
প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার ৬
প্রথম অধ্যায়: সামাজিক নিরীক্ষার প্রেক্ষিত ১৩
১.১ প্রাক-কথা ১৫
১.২ সামাজিক নিরীক্ষা কী ও কেন? ১৬
১.৩ সুপ্র পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৬
১.৩.১ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্য ১৬
১.৪. সামাজিক নিরীক্ষা কাজের সীমাবদ্ধতাসমূহ/চ্যালেঞ্জ ১৭
১.৫ সামাজিক নিরীক্ষায় অনুসৃত পদ্ধতিগত দিক ১৭
১.৫.১ পদ্ধতি ১৭
১.৫.২ নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ভৌগোলিক এলাকা ১৮
১.৫.৩ উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ১৮
১.৫.৪ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনা ১৮
দ্বিতীয় অধ্যায়: পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন; স্বাস্থ্যসেবা চিত্র ১৯
২.১ স্বাস্থ্যসেবায় সামাজিক নিরীক্ষার প্রেক্ষিত ২১
২.১.১ জনবল ২২
২.১.২ আবাসন ব্যবস্থা ২৩
২.১.৩ প্রশিক্ষণ ২৪
২.১.৪ অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ ২৪
২.১.৫ চিকিৎসা সেবার মান ও ফি ২৭
২.১.৬ সরবরাহকৃত ঔষধ ও খাবার ৩৩
২.১.৭ ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ানদের দক্ষতা ও সেবা ৩৬
২.১.৮ বরাদ্দকৃত বাজেট ৩৭
২.১.৯ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সার্বিক পরিবেশ ৩৯
২.১.১০ সেবা গ্রহীতাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত ৩৯
২.১.১১ কেইস স্টোরি ৪০
২.২ সুপারিশসমূহ ৪১
অধ্যায় তিন: পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন; প্রাথমিক শিক্ষা চিত্র ৪৩
৩.১ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা চিত্র ৪৫
৩.১.১ স্কুল পর্যায়ে বাজেট বরাদ্দের প্রক্রিয়া ও পরিমাণ ৪৫
৩.১.২ ভর্তি ও সমাপনী ৪৬
৩.১.৩ বিনা মূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ ৪৭
৩.১.৪ শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকদের অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব ৪৮
৩.১.৫ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান ৫০
৩.১.৬ স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির ভূমিকা ৫১
৩.১.৭ অবকাঠামো ৫২
৩.১.৮ উপবৃত্তি ৫৪
৩.১.৯ মিড-ডে মিল ৫৪
৩.১.১০ জনবল ৫৫
৩.১.১১ সুপারিশসমূহ ৫৫
অধ্যায় চার: উপসংহার ৫৭

সামাজিক নিরীক্ষার প্রেক্ষিত

১. ১ প্রাক-কথা

উন্নয়নের উপায় ও লক্ষ্য হলো মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সে কারণে সক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। কেননা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো অত্যাবশ্যকীয় সেবাখাতের উন্নয়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই নয়; এটি জীবনের গুণগত মান ও সামাজিক প্রগতির ভিত্তিস্বরূপ। এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নকে দারিদ্র্য নিরসনের কৌশল হিসেবেও গণ্য করা হয়। সমাজের সুষম উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় সেবাখাতে শ্রেণি-লিঙ্গ-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানর ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "*রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা.....*"। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ঘোষণার মাধ্যমে জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করতে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দে সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি অগ্রাধিকার হিসেবে বলা হলেও এই খাত দুটোর প্রধান সমস্যাগুলো সমাধানের বিষয়টি আমাদের জাতীয় বাজেটে খুব একটা বিবেচনায় নেয়া হয় না। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দাতাদের নির্দেশিত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রভাব থাকায় অত্যাবশ্যকীয় সেবাখাতগুলোতে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে, বাড়ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। এর ফলে দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছর এ খাতগুলোতে বাজেট বরাদ্দ কমছে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক চাহিদা এবং মৌলিক মানবাধিকার। অত্যাবশ্যকীয় এই সেবাখাতে জনগণের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। এর জন্য প্রয়োজন বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো ও নিয়ন্ত্রণবিহীন বেসরকারি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থাপনা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই দুটো খাতে যে পরিমাণ বাজেট থাকা দরকার সে পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় না। চলতি অর্থবছরের (২০১০-১১) জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে মোট বরাদ্দ যথাক্রমে ১৮,৪০২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা মোট বাজেটের ১৩.৯% এবং মোট জিডিপির মাত্র ২.৩% এবং ৮,১৪৭ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬.২% এবং মোট জিডিপির মাত্র ১%। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিরাজমান নানাবিধ সমস্যা দূরীকরণের জন্য দেশের মোট জনসংখ্যার বিবেচনায় এই বাজেট খুবই অপ্রতুল। আন্তর্জাতিক বিধি অনুসারে একটি দেশের উন্নয়নের জন্য জিডিপির কমপক্ষে ৬% শিক্ষাখাতে এবং জিডিপির ৫% স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ থাকা দরকার হলেও আমাদের জাতীয় বাজেট বরাদ্দে কোনও বছরই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ যথাক্রমে জিডিপির ২% এবং স্বাস্থ্যখাতে ১% এর বেশি বরাদ্দ দেয়া হয় না। অন্যদিকে, অপ্রতুল এই বাজেট কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত হয় বলে এখানে অঞ্চলভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক চাহিদাগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয় না বলে বাজেটের সুষম বণ্টন হয় না। এছাড়া বরাদ্দকৃত বাজেটের যথাযথ ও কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব থাকায় জনগণ যে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে যে ধরনের সেবা পাওয়ার কথা তা পায় না। দেখা যায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার জন্য সরকারিভাবে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সকল মানুষের তথ্যে অভিগম্যতা না থাকার ফলেও সাধারণ জনগণ সেবা প্রাপ্তি থেকে নিয়মিত বঞ্চিত হচ্ছে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির চাহিদা শ্রেণি-লিঙ্গ-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের। সরকারি অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগণ যাতে তাদের প্রাপ্য সেবা পায় সেজন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র ২০ জেলায় সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে উল্লেখিত সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো বিরাজমান সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের শিক্ষা ও

স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তৈরি করাসহ প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে এলাকার জনগণের মধ্যে সচেতনতা এবং জনমত তৈরি করা হয়েছে।
এক্ষেত্রে সচেতন নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকা ও লক্ষ্যাভিমুখী সামাজিক আন্দোলনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১.২. সামাজিক নিরীক্ষা কী ও কেন?

জবাবদিহিতার অনেকগুলো টুল-এর মধ্যে একটি হলো সামাজিক নিরীক্ষা। সামাজিক নিরীক্ষা অংশগ্রহণমূলক একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সেবা গ্রহণকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি সেবার পর্যাপ্ততা, মান, দুর্বলতা এবং সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণের সমন্বিত মতামত জানা সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রমে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করার জায়গা থাকে ফলে তাদের বক্তব্যও তুলে ধরা সম্ভব হয়।

একটি গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে তৃণমূল মানুষের চাহিদা যেভাবে প্রতিফলিত হওয়া দরকার সেটি অনেকসময় নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রতিফলিত হয় না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যেও জবাবদিহিতার অভাব থাকে বলে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়।

সামাজিক জবাবদিহিতার এই টুলগুলোর মধ্য দিয়ে অধিকারবঞ্চিত মানুষ অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হতে পারে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো অত্যাবশ্যকীয় সেবাখাতে সামাজিক নিরীক্ষা ও পারফরমেন্স মনিটরিং-র মধ্য দিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জনগণের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা যায়। এই গবেষণায় জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মধ্য দিয়ে 'সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি' গঠণ করা যায় যেখানে স্থানীয় জনগণই সমস্যা বের করে সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করে। সাধারণ নিরীক্ষার সাথে সামাজিক নিরীক্ষা/পারফরমেন্স মনিটরিং-এর পার্থক্য হলো সাধারণ নিরীক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় মানুষের কোনও অংশগ্রহণ থাকে না কিন্তু সামাজিক নিরীক্ষায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ/সম্পৃক্ততা থাকে।

১.৩ সুপ্র পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিভিন্ন দেশে সামাজিক নিরীক্ষা এবং পারফর্মেন্স মনিটরিং এর মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং দরিদ্র, বঞ্চিত জনগণের জনসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সফলতা বিবেচনায় বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর সেবার মান বৃদ্ধি ও দরিদ্রবান্ধব সেবা প্রতিষ্ঠানে উন্নীতকরণে নীতি-কৌশল প্রণয়নে সুপারিশমালা তৈরি এবং এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য অধিপরামর্শ ও প্রচারাভিযানের লক্ষ্যে সুপ্র ২০১০ সাল থেকে সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

১.৩.১ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্য

১. সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরাজমান সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
২. সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম দক্ষতা ও কর্মমান নিরূপণ করা;
৩. দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তৈরি করা;
৪. প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে এলাকার জনগণের মধ্যে সচেতনতা এবং জনমত তৈরি করা;
৫. সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মমান উন্নতকরণে অধিপরামর্শ করা;
৬. দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের পথ সুগম করা।

১.৪. সামাজিক নিরীক্ষা কাজের সীমাবদ্ধতাসমূহ/চ্যালেঞ্জ

এই পরিবীক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তথ্য প্রাপ্তিতে কিছুটা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে এখনও পুরোপুরি জনসচেতনতা তৈরী না হওয়াতে কেউই তথ্য প্রদানে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন নি। অনেকক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সত্ত্বেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কিছু কর্মচারি গোপনীয়তার দোহাই দিয়ে তথ্য দিতে চান নি। বিশেষ করে বাজেট সম্পর্কিত তথ্য দিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ অনীহা প্রকাশ করেছেন। তথ্য প্রাপ্তির জন্য তথ্য সংগ্রহকারীকে বারবার যেতে হয়েছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলিতে কি পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছে তা পাওয়া যায় নি। এছাড়া পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-ফিতর থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ করা যায় নি।

১.৫ সামাজিক নিরীক্ষায় অনুসৃত পদ্ধতিগত দিক

১.৫.১ পদ্ধতি

এটা স্পষ্ট যে, সামাজিক নিরীক্ষা উদ্‌যোগটি কোনো একাডেমিক গবেষণার অংশ নয়। বরং সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানকে আরও জবাবদিহি ও কার্যকর করার লক্ষ্যে নাগরিক সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার অংশ হিসেবে নিরীক্ষা কার্যক্রম করা হয়েছে। সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (সেকেন্ডারি) উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য রিপোর্ট কার্ড জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। রিপোর্ট কার্ড জরিপ একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যার মাধ্যমে সরকারের যে সমস্ত সেবাসমূহ জনগণের পাওয়ার কথা ছিল সেগুলো সঠিকভাবে পেয়েছে কি-না, পেলে সেগুলোর গুণগত মান কেমন ছিল, যে সময় পাওয়ার কথা ছিল তা এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা যাচাই করা ইত্যাদি বিষয়গুলি এই জরিপের মাধ্যমে জানা যায়। এছাড়া রিপোর্ট কার্ড জরিপে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যের সমন্বয় থাকে বলে সামাজিক নিরীক্ষার জন্য এটি অনেক বেশি যৌক্তিক, নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিবেচনা করে সুপ্র প্রাথমিক শিক্ষা এবং সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর সামাজিক নিরীক্ষায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করে নিরীক্ষা কাজ পরিচালনা করেছে। রিপোর্টকার্ড জরিপ পদ্ধতিতে অনুসৃত কৌশলসমূহ হলো:

- সাক্ষাতকার (আধা-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন)
- এফজিডি
- কেইস স্টোরি

মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে মূলত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, জার্নাল ও গবেষণা প্রতিবেদন, জাতীয় বাজেট ডকুমেন্ট ও বই-পুস্তক থেকেই এ নিরীক্ষাপত্রের তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে।

নিরীক্ষায় Cluster Sampling কৌশল ব্যবহার করে ২০ জেলা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং উত্তরদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে Judgemental Sampling কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবার উত্তরদাতারা হলেন, জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও), ফার্মাসিস্ট, টেকনিশিয়ান, বহির্বিভাগের রোগী, অন্তঃবিভাগের রোগী, নার্স, উপজেলা পর্যায়ে থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, ফার্মাসিস্ট, টেকনিশিয়ান, বহির্বিভাগের রোগী, অন্তঃবিভাগের রোগী, নার্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে ডাক্তার, স্বাস্থ্য সহাকারী, রোগী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ।

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে উত্তরদাতারা হলেন, জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীবৃন্দ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ।

১.৫.২ নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ভৌগোলিক এলাকা

এই সামাজিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজটি করতে গিয়ে সুপ্র তার নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত ৪৫ জেলা হতে উপযোগিতা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০ জেলার প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করেছে। নিরীক্ষার আওতাভুক্ত জেলাগুলো হলো-নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, নাটোর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম, বরগুনা, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শরীয়তপুর এবং রাজবাড়ী।

জনবল, সময় ও জনবল বিবেচনায় ২০ জেলার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিরীক্ষায় জেলা পর্যায় থেকে ১টি সদর হাসপাতাল, উপজেলা পর্যায় থেকে ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন পর্যায় থেকে ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক নির্বাচন করা হয়েছে। একইভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত নিরীক্ষাভুক্ত কর্মএলাকার জেলা পর্যায় থেকে জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিস, জেলা পর্যায়ের ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপজেলা পর্যায়ের ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সদর এলাকা, সদর এলাকার নিকটবর্তী বিদ্যালয় এবং প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয় বিবেচনা করা হয়েছে।

১.৫.৩ উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

এই নিরীক্ষা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্ত সরাসরি মাঠ পর্যায়ে উত্তরদাতার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মাধ্যমিক উপাত্ত উল্লেখিত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে বিভিন্ন বই, হাজিরা খাতা, লেজার বই, লগ সিট, বিভিন্ন তালিকা, প্রতিবেদন, পরিকল্পনাপত্র, রেজিস্টার খাতা ইত্যাদি থেকে নেয়া হয়েছে। মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে জেলা ভিত্তিক পৃথক পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় পাশাপাশি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটারবেজড্ সফ্টওয়ার ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৫.৪ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনা

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত রূপ পাওয়ার আগে এটি দু'টি সুনির্দিষ্ট ধাপ অতিক্রম করেছে। প্রথমত, তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক উপাত্তের ভিত্তিতে জেলাভিত্তিক স্বতন্ত্র খসড়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (শিক্ষা কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন, ডাক্তার, শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম কর্মীসহ অন্যান্য পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ) সাথে ২০টি মতবিনিময় সভা। দ্বিতীয়ত, সমন্বিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভায় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এ সকল মতবিনিময় সভার মধ্য দিয়ে যেসব দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি ও প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে সেগুলো এ প্রতিবেদনে সমন্বয় করা হয়েছে

স্বাস্থ্যসেবায় সামাজিক নিরীক্ষার প্রেক্ষিত

২.১. স্বাস্থ্যসেবায় সামাজিক নিরীক্ষার প্রেক্ষিত

স্বাস্থ্যকে মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকারও বৈষম্যহীনভাবে জনগণের স্বাস্থ্য অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করতে আন্তর্জাতিকভাবে এবং সাংবিধানিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ নং এবং ১৮ (১) নং অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২৫-এ বলা হয়েছে "মানসম্মত জীবনযাত্রার জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্য ও কল্যাণের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সেবা এবং সুবিধালাভের অধিকার প্রত্যেকের প্রাপ্য"। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির (ICESCR) অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী "প্রত্যেকের সর্বোত্তম শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভোগ করার অধিকার রয়েছে।" ১৯৭৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলমাআতা ঘোষণায় স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের অভিগম্যতাকে একটি অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পৃথিবীর সকল দেশ তা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ২০০০ সালের জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন ঘোষণায় এ অধিকারের বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করে উন্নয়নের কেন্দ্রে স্থান দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করে।

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকারকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা অবকাঠামো উপজেলা ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। বছর বছর এ খাতে সরকারি ব্যয় বাড়লেও প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে দেখা যায়, স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৮,১৪৭ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬.২% এবং জিডিপির ১% যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মাঝারি মানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য জিডিপির ৫% বরাদ্দ প্রয়োজন। ২০০০ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে আমাদের জনপ্রতি ন্যূনতম খরচ বলা হয়েছিল ১২ মার্কিন ডলার যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, জনপ্রতি স্বাস্থ্য বাবদ আমাদের ন্যূনতম খরচ হওয়া উচিত কমপক্ষে ৩৪ মার্কিন ডলার। স্বাস্থ্যখাতে যে ব্যয় হয় তার ৬০% ব্যয় জনগণ ব্যক্তিগতভাবে খরচ করে।

দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার জন্য পর্যায়ক্রমে ১৮০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক চালুর উদ্‌যোগ নেয়া হয়েছে যার মধ্যে চালু করা হয়েছে ১০,৭২৩টি, ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহ মিলিয়ে আরো ৪৫০০টির অধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৩২টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চালু রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের সাম্প্রতিক তথ্যসূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫ কোটি মানুষের জন্য সরকারি ডাক্তার রয়েছে ১২ হাজার যেখানে পদ রয়েছে প্রায় ১৯ হাজার। ডাক্তার-নার্স-টেকনিশিয়ান সব মিলিয়ে শূন্য পদের সংখ্যা ২৬ হাজার। উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গড়ে ১ লাখ মানুষের জন্য ১০ জন প্রশিক্ষিত ডাক্তার থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে সেখানে ১ জনের বেশি ডাক্তার নেই। এখনো বাংলাদেশের ৪,৭১৯ জনের জন্য ১ জন ডাক্তার ও ৮,২২৬ জনের জন্য একজন করে নার্স রয়েছে।

এখনো প্রতি বছরের মোট স্বাস্থ্যসেবা চাহিদার মাত্র ২৫-৩০% সরকারি খাত থেকে এবং ৭৫-৮০% বেসরকারি খাত হতে পূরণ হয়[১]। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে অনুমোদনপ্রাপ্ত হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে ২,১১৬টি, ডেন্টাল ক্লিনিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৬৩৯টি। তালিকাভুক্তির বাইরে অনুমোদনহীন স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এর চেয়ে ৩-৪ গুণ বেশি। বেসরকারি চিকিৎসাখাতের এই দ্রুত বিকাশের ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

[১]ডাক্তার-নার্স-টেকনিশিয়ান সব মিলিয়ে শূন্য পদের সংখ্যা ২৬ হাজার। উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গড়ে ১ লাখ মানুষের জন্য ১০ জন প্রশিক্ষিত ডাক্তার থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে সেখানে ১ জনের বেশি ডাক্তার নেই। এখনো বাংলাদেশের ৪,৭১৯ জনের জন্য ১ জন ডাক্তার ও ৮,২২৬ জনের জন্য একজন করে নার্স রয়েছে।

বিরাজমান এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকৃত এই বাজেট সার্বিক স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন এবং বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগণ স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে কিনা, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কী কী প্রতিবন্ধকতা বিরাজ করছে এবং সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতাবৃদ্ধির উপায় খোঁজা এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও বেশি কার্যকর ও দরিদ্রবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে সুপ্র ২০টি জেলায় সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করেছে।

সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা চিত্র বিশেষ করে জনবল ও আবাসন, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ, সেবার মান, ফি, ঔষধ, খাবার, হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশ, ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ানদের দক্ষতা ও সেবা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট সম্পর্কিত তথ্য স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন স্তর যেমন; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.১.১ জনবল

স্বাস্থ্য পরিসেবার জন্য প্রথমেই দরকার পর্যাপ্ত ও দক্ষ জনবল। সরকারের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক খাতগুলোর মধ্যে হাসপাতালভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অন্যতম। এ কর্মসূচিতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের মাধ্যমে এসব হাসপাতালে চিকিৎসা সুযোগ নিশ্চয়তার জন্য বলা হয়েছে। ২০১০-১১ সালের বাজেট বক্তৃতায় জনগণকে অধিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। স্বাস্থ্য অধিদফতরের সাম্প্রতিক তথ্যসূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫ কোটি মানুষের জন্য সরকারি ডাক্তার রয়েছে ১২ হাজার যেখানে পদ রয়েছে প্রায় ১৯ হাজার। ডাক্তার-নার্স-টেকনিশিয়ান সব মিলিয়ে শূন্য পদের সংখ্যা ২৬ হাজার। উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গড়ে ১ লাখ মানুষের জন্য ১০ জন প্রশিক্ষিত ডাক্তার থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে সেখানে ১ জনের বেশি ডাক্তার নেই। এখনো বাংলাদেশের ৪,৭১৯ জনের জন্য ১ জন ডাক্তার ও ৮২২৬ জনের জন্য একজন করে নার্স রয়েছে[২]। ইন্টারনেশনাল মেডিক্যাল কলেজের (আইএমসি) তথ্য মতে বর্তমানে দেশে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ১৭ হাজার ৬০৯টি নার্সের পদ শূন্য আছে। বর্তমানে দেশে ৬জন চিকিৎসকের বিপরীতে ১ জন নার্স রয়েছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, একজন চিকিৎসকের কাজে সহায়তা করার জন্য দরকার ৩জন নার্স এবং ৫জন স্বাস্থ্য সহকারী (অনুপাত ১:৩:৫)[৩]। স্বাস্থ্যসেবায় জনবল সংকটের মধ্যেও আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে। দেখাযায়, উপকুলীয়, পার্বত্য ও হাওর এলাকার হাসপাতালগুলোতে জনবল শূন্যতা বেশি। আবার জেলা শহরের তুলনায় উপজেলায় জনবল সংকট বেশি। জনবলের তীব্র সংকট দেখা যায় ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ২২ জন ডাক্তারের সৃষ্ট পদের অনুকূলে ১৪ জন আছে। নার্স, ব্রাদার ৪০ জনের জায়গায় আছে ৩৮ জন। ১জন করে সৃষ্ট পদের স্থলে সার্জারী, গাইনি, অর্থসার্জারী, মেডিসিন, এনেসথেসিয়া, শিশু, ডেন্টাল, এমও হোমিও বিশেষজ্ঞ থাকলেও চক্ষু, ইএনটি, রেডিওলজি, অর্থপেডিক ও ট্রমেটিক এবং আরএমও'র পদ শূন্য রয়েছে। ৫জন মেডিক্যাল অফিসারের স্থলে ৩ জন আছে ২টি পদ শূন্য রয়েছে।

চার্ট ২ক. স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজীয় জনবলের যথেষ্টতা

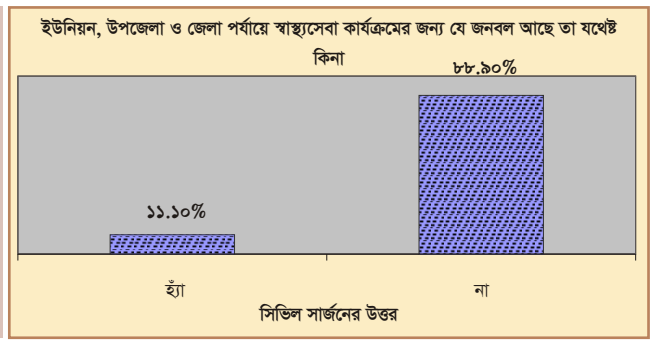

[২] দৈনিক আমার দেশ, ২০ এপ্রিল ২০১১
[৩] দৈনিক সংবাদ ৯ মে, ২০১১

১জন প্যাথলজিস্ট থাকলেও ১জন রেডিওলজিস্টের পদ শূন্য রয়েছে।

বরগুনা জেলায় মেডিকেল অফিসার পদে ২১ জন ডাক্তার, কর্মরত আছেন ৬ জন, ডেন্টাল সার্জন পদ ৪, কর্মরত নাই, স্বাস্থ্য পরিদর্শক পদ ১৫, কর্মরত ১২ জন, স্যানিটারি পরিদর্শক পদ ৫, কর্মরত ৫ জন, নার্স পদ ৯০জন, কর্মরত ৫৪ জন, পরিসংখ্যান সহকারী পদ ১, কর্মরত ১ জন, ল্যাব টেকনেশিয়ান পদ ১৬, কর্মরত ৯ জন, ফার্মাসিস্ট পদ ২১, কর্মরত ৫ জন, জেলায় ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম বি বি এস পদ ডাক্তার ৩০, কর্মরত ৬ জন, মেডিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট ২১৩, কর্মরত ১৯৬ জন।

নোয়াখালী জেলায় ২৫৮টি মেডিকেল অফিসারের পদ থাকলেও কর্মরত আছেন মাত্র ১৬০ জন। বাকী ৯৮টি পদই শূন্য। ডেন্টাল সার্জনের ৮টি পদের মধ্যে কর্মরত পদ মাত্র ৩টি। এভাবে প্রায় সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংকট রয়েছে হাসপাতালগুলোতে। জেলা সিভিল সার্জন ডা. মো. নুরুল ইসলাম জানান, সৃষ্ট পদের বিপরীতে প্রায় এক তৃতীয়াংশ পদই শূন্য রয়েছে।

নাটোর জেলায় ৮৯টি মেডিকেল অফিসারের পদ থাকলেও কর্মরত আছেন মাত্র ৬৩ জন। বাকী ২৬টি পদই শূন্য। ডেন্টাল সার্জনের ৬টি পদের মধ্যে কর্মরত পদ মাত্র ২টি। নাটোর জেলাতেও এভাবে প্রায় সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংকট রয়েছে হাসপাতালগুলোতে।

সামাজিক নিরীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, নিরীক্ষার আওতাভুক্ত জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে যে জনবল আছে তা যথেষ্ঠ নয়। ৮৮.৯০% জেলা সিভিল সার্জন মনে করে, হাসপাতালে পর্যাপ্ত জনবল নেই। মাত্র ১১.১০% উত্তরদাতা মনে করেন, হাসপাতালে জনবল যাও আছে সকলে কর্মরত থাকলে জনগণের অপর্যাপ্ততা থাকতো না। উত্তরদাতাদের মতে, একদিকে পদসংখ্যা কম এবং অন্যদিকে ছুটিতে ও প্রেষণে থাকার জন্য জনবলের আরও ঘাটতি তৈরি হয়েছে। নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১০০% নার্স মনে করেন, সেবা দেয়ার জন্য নার্সদের পদসংখ্যা যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্যখাতে এখনও ১৯৬৮সালের জনবল কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে। উপজেলা এবং সদর হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হলেও বাড়ানো হয় নি জনবল। বাজেটে বরাবরই স্বাস্থ্যখাত অবহেলিত থাকে। স্বাস্থ্যখাতে যেখানে বরাদ্দকৃত বাজেটের সিংহভাগই চলে যায় বেতন-ভাতা খাতে সেখানে জনবল কাঠামোর চিত্র স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দের অবহেলাকেই নির্দেশ করে।

টেবিল: ২.১

সেবা দেয়ার জন্য নার্সদের পদসংখ্যা যথেষ্ট কিনা	
যথেষ্ট	যথেষ্ট না
০%	১০০%

২.১.২ আবাসন ব্যবস্থা

নিরীক্ষার আওতাধীন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারপরিকল্পনা কেন্দ্র থেকে শুরু করে জেলা সদর হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তারদের আবাসনের ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলোর অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। জেলা সদর হাসপাতালে নার্সদের জন্য আবাসন সুবিধা থাকলেও জেলা সদর হাসপাতালের ৯৫% বলেছেন, আবাসনের সুবিধা রয়েছে কিন্তু আবাসনের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। ৫% নার্স বলেছেন, তাদের জন্য কোনও আবাসন সুবিধা নেই।

টেবিল: ২.২

হাসপাতালে নার্সদের আবাসন ব্যবস্থা	
আছে	নাাই
৯৫%	৫%

তৃণমূল মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সহজলভ্য এবং অল্প খরচের মাধ্যম হলো ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক। এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত ডাক্তারদের পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান করে তৃণমূল মানুষের

সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিরীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আবাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ৪১.২ শতাংশ ডাক্তার বলেছেন তাদের জন্য হাসপাতালে কোন আবাসিক ব্যবস্থা নাই। ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে আবাসনের ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলো বসবাসের উপযোগী নয় বলে মন্তব্য করেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র আবাসনের ব্যবস্থা থাকলেও কেউ থাকেন না। সবগুলো রুমেই অনেকদিন ধরে তালা ঝুলছে।

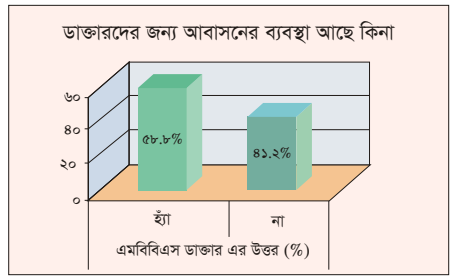

২.১.৩ প্রশিক্ষণ

দেশে চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিক্সদের চিকিৎসাসংক্রান্ত শিক্ষা এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উপযোগী একটি দক্ষ স্বাস্থ্যসেবা কর্মী গড়ে তোলা দরকার। সরকারের কর্মপরিকল্পনায় উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কমিউনিটিভিত্তিক প্রশিক্ষিত ও দক্ষ ধাত্রীর সংখ্যা ২০১৪ সালের মধ্যে বর্তমানের ৬০২৯ জন থেকে ৯০২৯ জনে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে।[৪] দেশের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় নিয়োজিত সরকারি/বেসরকারি সকল স্তরের চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিয়মিত পেশাগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কোর্স ও কনটিনিউয়িং মেডিকেল এডুকেশন প্রদানের কথা জাতীয় খসড়া স্বাস্থ্যনীতিতে উল্লেখ করা হলেও বাস্তব পরিস্থিতে দেখা যায় নার্সদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের তেমন কোনও সুযোগ নেই। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২৫% নার্স বলেছেন যে, হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সদেরকে ভাল কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না (টেবিল ২.৩)। অথচ গুণগত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা খুবই জরুরী।

টেবিল: ২.৩

নার্সদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কিনা	
প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	হয় না
৭৫%	২৫%

সদর হাসপাতালগুলোতে ল্যাব টেকনিশিয়ানরা সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তাদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ব্যবহার করতে হয়। তাই হাসপাতালে যন্ত্রপাতির সঠিক যোগান না থাকলে কিংবা আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান না করলে তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারবে না

২.১.৪ অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকা জরুরি। প্রতিটি স্তরের হাসপাতালগুলোতে রয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের সংকট। সরকার উপজেলা পর্যায়ের

চার্ট ২.গ: থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যা অনুযায়ী পর্যাপ্ত উপকরণ ও জনবল

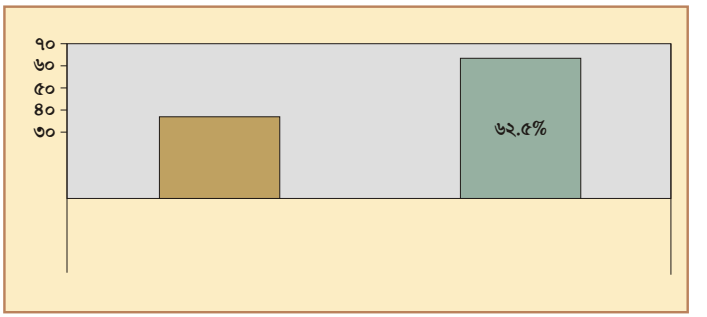

[৪] জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন, ২০১০-১১, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

টেবিল: ২.৪

জেলা সদর হাসপাতালে অবকাঠামো ও চিকিৎসা উপকরণ		
সদর হাসপাতালের সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়	সিভিল সার্জনের উত্তর (%)	
	হ্যাঁ	না
হাসপাতালে সেবা গ্রহণকারী অনুপাতে পর্যাপ্ত উপকরণ ও জনবল আছে কিনা	০.০	১০০.০
স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে কিনা	২৭.৮	৭২.২

হাসপাতালগুলোকে ৩০ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ১৪২টি উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় এবং ৯টি জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।[৫] উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হলেও বাড়ানো হয় নি পর্যাপ্ত উপকরণ, আধুনিক সরঞ্জাম ও জনবল। সামাজিক নিরীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যে ৬২.৫ শতাংশ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বলেন, উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে শয্যা অনুযায়ী পর্যাপ্ত উপকরণ ও জনবল নেই (চার্ট ২.গ)। এর ফলে দেখা যায় সেবা নিতে আসা রোগীরা নানামুখী সমস্যায় পড়ে। ফলে তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র জনগণকে জেলা হাসপাতাল বা বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা নিতে বাড়তি অর্থ ব্যয় করতে হয়।

সরকারের উন্নয়ন বাজেটে হাসপাতালগুলোতে যথাযথ অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামতের জন্য অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ থাকলেও বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে সেগুলোও ধীরগতিতে বাস্তবায়ন হয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাৎসরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।

নিরীক্ষার প্রাপ্ত তথ্য প্রদত্ত টেবিল ২.৪ অনুযায়ী, সকল সিভিল সার্জন বলেছেন জেলা হাসপাতালগুলোতে সেবা গ্রহণকারী অনুপাতে পর্যাপ্ত চিকিৎসা উপকরণ ও জনবল নেই। এদের মধ্যে ৭২.২ শতাংশ সিভিল সার্জন মনে করেন স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি জেলা হাসপাতালগুলোতে নেই। এছাড়া আধুনিক যন্ত্রপাতি চালানোর মতো প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলেরও অভাব রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য দরকার সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়। এর জন্য জেলা থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যাপ্ত ডায়াগনসিসের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সদর হাসপাতালের ৬৩.২ শতাংশ ল্যাব টেকনিশিয়ানদের দেয়া তথ্য মতে, জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে ডায়াগনসিসের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আছে কিন্তু ৩৬.৮ শতাংশর মতে ডায়াগনসিসের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হাসপাতালে নেই। উপকরণ যা আছে সেগুলো সম্পর্কে ৮৪.২ শতাংশ ল্যাব টেকনিশিয়ান বলেছেন সেগুলো সচল বা কার্যক্ষম। উপজেলা পর্যায়ে এই চিত্র আরও ভয়াবহ। নোয়াখালী জেলার সুবর্ণপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সের ল্যাব টেকনিশিয়ান গোলাম মাওলা জানান (৪৫), ল্যাবে অনেক রিঅ্যাজেন্ট ব্যবহার করা হয়

টেবিল: ২.৫

হাসপাতালের প্রয়োজনীয় ডায়াগনসিস সুবিধা		
সদর হাসপাতাল	ল্যাব টেকনিশিয়ান এর উত্তর (%)	
	হ্যাঁ	না
ডায়াগনসিসের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আছে কিনা	৬৩.২	৩৬.৮
ডায়াগনসিসের প্রয়োজনীয় উপকরণ সচল/কার্যক্ষম কিনা	৮৪.২	১৫.৮
দায়িত্ব পালনে অসুবিধা হয় কিনা	১০০	০.০

[৫] বাজেট বক্তৃতা: ২০১০-১১, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা-৪২

যেগুলোর মেয়াদ প্রায় শেষ পর্যায়ে অথবা বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ উপকরণ ও বিকল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য। সত্যিকার ভাবে এ সকল পরীক্ষার ফলাফল কোনটির সঠিক আসে না। তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য যেখানে ইউনিয়ন পর্যায়ে ডায়াগনসিসের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন সেখানে ইউনিয়ন পর্যায়ে ডায়াগনসিসের কোনও ব্যবস্থা নেই বল্লেই চলে।

জনবল সংকট, পরিমিত ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, নানা অব্যবস্থাপনা ও জটিলতার কারণে ল্যাব টেকনিশিয়ানদের দায়িত্ব পালনে না অসুবিধায় পড়তে হয়। নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল ল্যাব টেনিশিয়ানরা বলেছেন তাদের দায়িত্ব পালনে অসুবিধা ভোগ করতে হয় (টেবিল ২.৫)।

জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে এ্যাম্বুলেন্স, জরুরি রোগী ও প্রতিবন্ধী রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। কিন্তু দেখা যায়, হাসপাতালগুলোতে এগুলো ঠিকমত থাকে না। নিরীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২২.২ শতাংশ জেলা সিভিল সার্জন বলেছেন সদর হাসপাতালগুলোতে এ্যাম্বুলেন্স, জরুরি রোগী ও প্রতিবন্ধী রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে (টেবিল ২.৬)। কিন্তু পর্যবেক্ষণ ও রোগীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে এগুলোর ব্যবস্থা থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। নোয়াখালী সদর হাসপাতলে রোগীদের জরুরি সেবা দেয়ার জন্য ৩টি এ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ২টি নষ্ট, বাকী একটি দিয়ে কাজ চলে। জরুরি অক্সিজেন থাকলেও পর্যাপ্ত নয়। রোগ নির্ণয়ের জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও জনবল নেই। বিশেষ করে অর্থোপেডিক সার্জারির জন্য উপকরণ ও ডিজিটাল আলট্রা, এক্সরে আধুনিক নয়। গত ২/৩ বছর ধরে প্রয়োজনীয় অপারেটর ও জ্বালানীর অভাবে হাসপাতালের জেনারেটরটি বন্ধ রয়েছে স্থানীয় ভাবে ব্যবস্থা করে শুধুমাত্র অপারেশন থিয়েটারে জরুরি অপারেশনের জন্য একটি জেনারেটর ব্যবহার করা হয়। (সামাজিক নিরীক্ষার নোয়াখালী জেলা প্রতিবেদন)।

টেবিল: ২.৬

জেলা সদর হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা সরঞ্জামাদি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য		
সেবা সংক্রান্ত বিষয়	জেলা সিভিল সার্জনের উত্তর (%)	
	হ্যাঁ	না
হাসপাতলে এ্যাম্বুলেন্স, জরুরি রোগী ও প্রতিবন্ধী রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ্যা আছে কিনা	৭৭.৮	২২.২
হাসপাতালে বিদ্যুৎ না থাকলে তার বিকল্প ব্যবস্থা আছে কিনা	৮৩.৩	১৬.৭

চার্ট ২ঘ: থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি

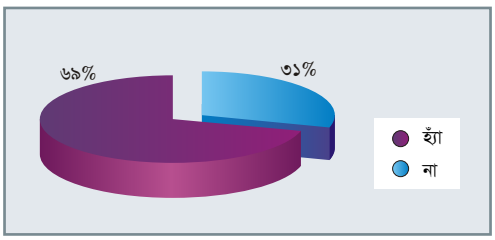

বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকায় অপারেশনের সময় অবর্ণণীয় দুর্ভোগের স্বীকার হতে হয়। নিরীক্ষায় ৬৯ শতাংশ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বলেছেন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য তাদের কোন বিকল্প ব্যবস্থা হাসপাতালে নেই।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অন্তঃবিভাগের রোগীর আত্মীয় বলেন, "সিজার চলছে, বিদ্যুত চইলে গেল, ডাক্তার আমাকে দ্রুত চার্জার লাইট কিনে আনতি বুইলল, কিনে আনলাম ভাল আলো হইলো না, আবার ছুটে যায়ে দোকানতি আরেকটা লাইট কিনে আনলাম তাতেও হইলো না রাত প্রায় ১২ টা আমার ছুটাছুটি দেখে দোকনের পাশে বসে থাকা এক ভদ্রলোক বুইলল আমার বাড়ি বিদেশী লাইট আছে। তার সাথে রিকসায় প্রায় ১ মাইল দুরি যায়ে লাইট নিয়ে আসলাম।"

তৃণমূল পর্যায়ে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির সহজলভ্য স্থান হচ্ছে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। এই হাসপাতালগুলোতে রোগীদের উপযুক্ত সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক এ্যাম্বুলেন্স, জরুরি রোগী ও প্রতিবন্ধী রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও এগুলো সঠিকভাবে থাকে না।

চার্ট ২৬: থানা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ

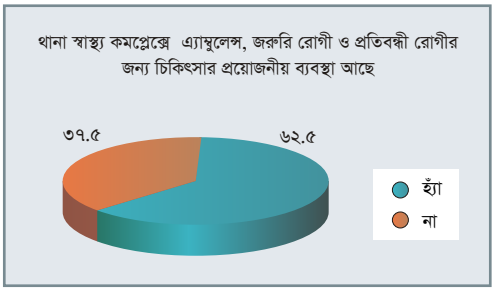

হাসপাতালের অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ, প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ কেনার ক্ষেত্রে কিছু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আছে। যেমন: ডিজি অফিস থেকে অনেক যন্ত্রপাতির দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয় যা বাজারের সাথে সামঞ্জস্য নয়। যার ফলে অনেক যন্ত্রপাতি কেনা যায় না। আবার কিছু কিছু যন্ত্রপাতির চাহিদা না থাকলেও হাসপাতালের জন্য পাঠানো হয়। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ৪৩.৭৫ শতাংশ থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বলেছেন, হাসপাতালে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও বিভিন্ন উপকরণ কেনা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা রয়েছে।

চার্ট ২৮: থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

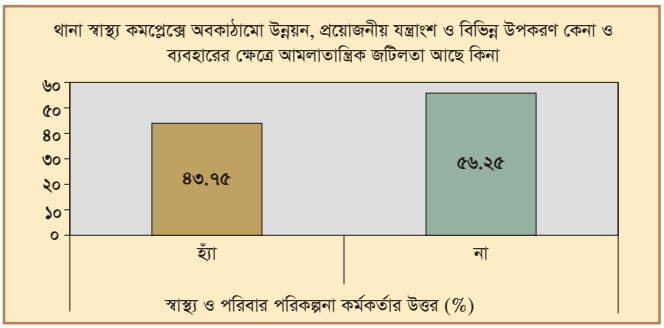

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদির ক্রয় ও মেরামতের জন্য সরকারের যথেষ্ট বাজেট রাখা দরকার। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে স্বাস্থ্যখাতে যে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় তা দিয়ে চাহিদা অনুযায়ী হাসপাতালগুলোর চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনা সম্ভব নয় বলে মনে করে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

২.১.৫ চিকিৎসা সেবার মান ও ফি

সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০১০-২০২১) সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তার কথা বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ চায় সরকারি হাসপাতাল থেকে স্বল্প খরচে চিকিৎসা সেবা পেতে। চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে চিকিৎসার গুণগত মান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিরীক্ষার তথ্যানুযায়ী, ৬৮.৪% অন্তঃবিভাগের রোগী বলেছেন তারা চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা হাসপাতাল থেকে করেছেন এবং ৩১.১% বাইরে থেকে (ক্লিনিক) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

চার্ট ২৯: চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা

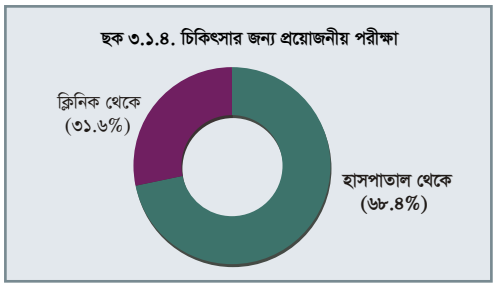

তার কারণ হলো এখনও হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও জনবলের অভাব এবং সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষার ও নিরীক্ষার মান ভালো না। এতে করে সেবা গ্রহনকারীরা বিভিন্নভাবে প্রতারিত এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সেবা গ্রহণকারীরা তাদের যথাযথ সেবা পাবার ব্যাপারে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রত্যাশা করে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে রোগীরা ডাক্তারদের সেবা বিষয়ে সন্তুষ্ট নয়। বহিঃবিভাগের রোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২৬.৩ শতাংশ রোগী বলেছেন, চিকিৎসার সময় ডাক্তাররা ঠিকমতো কথা শুনেন নি। ৩৬.৮ শতাংশ রোগী হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় সেবা পান নি বলে অভিযোগ করেন।

টেবিল: ২.৭

হাসপাতালের বহিঃবিভাগের রোগী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য		
সেবা সংক্রান্ত বিষয়	রোগীর উত্তর (%)	
	হ্যাঁ	না
ডাক্তার চিকিৎসার সময় রোগীর কথা ঠিকমত শুনেন কিনা	৭৩.৭	২৬.৩
চিকিৎসার সময় রোগীরা প্রয়োজনীয় সেবা পায় কিনা	৬৩.২	৩৬.৮

প্রতিটি জেলা সরকারি হাসপাতালে বহিঃবিভাগ এবং অন্তঃবিভাগের রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট হারে ফি চার্জ করে থাকে। বহিঃবিভাগ এবং অন্তঃবিভাগের সকল রোগীই হাসপাতল থেকে সেবা পাওয়ার জন্য নির্ধারিত ফি দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দালালদের চক্রে পড়ে রোগীরা নির্ধারিত ফি'র সাথে অতিরিক্ত অনেক ফি প্রদান করেছেন। সাধারণত জ্বর, পেটের পীড়া, শ্বাস তন্ত্রের রোগী, সার্জিকাল, গাইনী/প্রসূতি রোগীরা বহিঃবিভাগে চিকিৎসা নিতে আসেন। বহিঃবিভাগে ডাক্তার নিয়মিত দায়িত্ব পালন করলেও জরুরি বিভাগে ডাক্তার নিয়োগ অপ্রতুল থাকায় রোগীরা যথাযথ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সেবা প্রদানকারী ৯০% জেলা সিভিল সার্জনও মনে করেন, যায় হাসপাতাল প্রদত্ত সেবাসমূহ রোগীদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী যথেষ্ট নয়। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে ডাক্তার, নার্স স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ না থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেন। ময়মনসিংহের সিভিল সার্জন বলেন, প্রতিদিন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বহিঃবিভাগ ও অন্তঃবিভাগসহ গড়ে দৈনিক ৮০০ রোগী ভর্তি হওয়ার কথা থাকলেও গড়ে ১৬০০ রোগী ভর্তি হয়। দ্বিগুণ রোগীকে সঠিকভাবে সেবা দেয়া সম্ভব হয় না।

নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতালের অন্তঃবিভাগে ভর্তির পর ওয়ার্ডে থাকাকালীন সেবা প্রদানকারী ডাক্তার ও নার্সদের সেবা প্রদান ও হাসপাতাল থেকে নির্দিষ্ট কিছু প্রকারের ঔষধ বিনামূল্যে পাওয়ার কথা থাকলেও নিরীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, তাদেরকে আলাদা টাকা বা ফি প্রদান করতে হয়েছে এবং বেশিরভাগ ঔষধ বাইরে থেকে কিনতে হয়েছে। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যে ৭৩.৭ শতাংশ

টেবিল: ২.৮

হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের রোগী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য		
হাসপাতালের সেবা সংক্রান্ত বিষয়	রোগীর উত্তর (%)	
অন্তঃবিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফি দিতে হয় কিনা	৮৯.৫	১০.৫
হাসপাতালে সেবার জন্য বাড়তি টাকা দিতে হয় কিনা	২৬.৩	৭৩.৭
ওয়ার্ডে থাকাকালীন সব ঔষধ	০.০	১০০.০

চার্ট ২জ: হাসপাতালে সেবার পর্যাপ্ততা

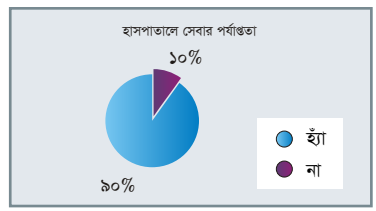

অন্তঃবিভাগের রোগীর হাসপাতালে সেবা পাবার জন্য কোনও টাকা বা ফি দিতে না হলেও ২৬.৩ শতাংশ অন্তঃবিভাগের রোগীদের সেবা পাবার জন্য টাকা বা ফি প্রদান করতে হয়েছে এবং দু'একটি ছাড়া সব ঔষধ বাইরে থেকে কিনতে হয়েছে। (টেবিল ২.৮)।

চার্ট ২ঝ: স্বাস্থ্যসেবায় অতিরিক্ত ফি

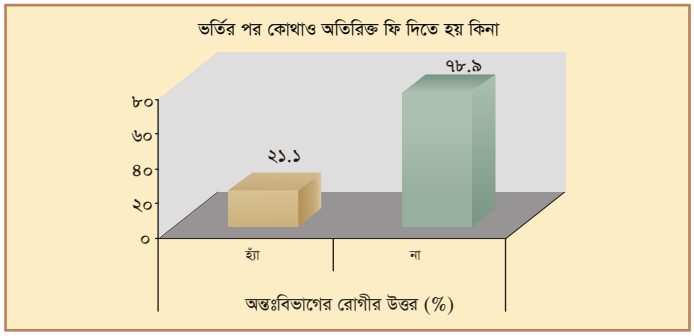

জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তির পর রোগীদের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঔষধপত্র কেনা এবং অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে দালালদের খপ্পরে পরে অতিরিক্ত ফি প্রদান করতে হয়। এছাড়া ওয়ার্ডবয়, আয়াদের সেবার জন্য অতিরিক্ত ফি বাধ্য হয়ে দিতে হয়। এতে করে রোগীদের ভোগান্তি অনেকাংশে বেড়ে যায়। সামাজিক নিরীক্ষালব্ধ তথ্যে দেখা যায়, ২১.১ শতাংশ অন্তঃবিভাগের রোগী দালালের খপ্পরে পড়ে টাকা দিতে হয়েছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ না থাকায় জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসা সেবা না পেয়ে উন্নততর চিকিৎসার জন্য সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর শরনাপন্ন হয়। সরকারি জেলা হাসপাতালে প্যাথলজি ও এক্সরে করার ক্ষেত্রে রোগী সাধারণকে ফি প্রদান করতে হয়। তবে উল্লেখিত বিভাগে ডাক্তার ও এক্সপার্ট না থাকায় গুণগত মান প্রশ্নসাপেক্ষ।

চার্ট ২ঞ: থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রদত্ত সেবার পর্যাপ্ততা

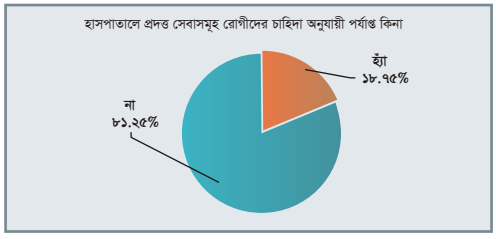

অন্যদিকে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দেখা যায়, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাব রয়েছে। রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জেলায় আসতে হয় কিংবা বেসরকারি ডায়াগনিসস্টিক সেন্টার থেকে করতে হয়। থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ৮১.২৫ শতাংশ থানা স্বাস্থ্য কর্মকতা বলেন, প্রদত্ত সেবা রোগীর চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ঠ নয়। তাদের মতে, উপজেলার জনসংখ্যা অনুপাতে ডাক্তার, নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব, অপ্রতুল শয্যা সংখ্যা, প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকা, নার্সদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ না থাকা ইত্যাদি কারণে তারা সঠিকভাবে চিকিৎসা সেবা দিতে পারে না। থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিনা মূল্যে সেবা দেয়া হলেও দুঃস্থ নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ কোনও ব্যবস্থা হাসপাতালে চালু নেই। বরগুনা জেলার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাসপাতালে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে হারিকেন আছে। থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগীদের ৬৮.৭৫ শতাংশ চিকিৎসার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্লিনিক থেকে করে থাকেন। এর কারণ হিসেবে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরীক্ষাগার ও পরীক্ষা সরঞ্জামাদি অপ্রতুল এবং অনেক ক্ষেত্রে অচল বলে উল্লেখ করেন।

চার্ট ২ট: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অন্তঃবিভাগের রোগী থেকে প্রাপ্ত সেবা

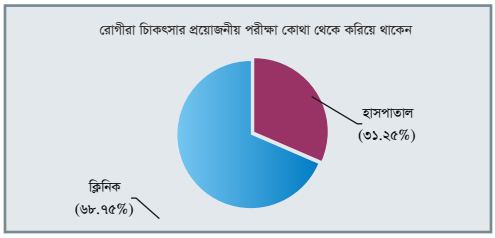

ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র হলো স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বনিম্ন স্তর এবং তৃণমূল পর্যায়ের মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সবচেয়ে সহজলভ্য স্থান। তাই ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পর্যাপ্ত পরিমাণ সেবা প্রদানের জন্য যথাযথ পরিমাণ লোকবল এবং সরঞ্জামাদি থাকা দরকার। এজন্য সরকারের যথাযথ বাজেট বরাদ্দও থাকা দরকার।

ইউনিয়ন পর্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা গেছে, ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত চিকিৎসা উপকরণ ও জনবলের অভাব আছে। এছাড়া ডাক্তারদের ইউনিয়ন পরিবার কল্যান কেন্দ্রে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে। নিরীক্ষার তথ্যানুযায়ী ৬৪.৭ শতাংশ পরিদর্শক মনে করেন মা ও শিশুর জন্য যে সেবা প্রদান করা হচ্ছে তা স্থানীয় রোগীদের চাহিদা অনুযায়ী অপর্যাপ্ত থেকে যায়। তারপরও ১০০ শতাংশ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক বলেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হয়।

ইউনিয়ন পর্যায়ে একজন এমবিবিএস ডাক্তার, ১জন মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট, ১জন ফার্মাসিস্ট ও ১জন এমএলএসের পদ রয়েছে। তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পদ থাকলেও ডাক্তাররা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করছেন না। মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট দিয়েই চলছে চিকিৎসা সেবা।

টেবিল: ২.৯

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের স্বাস্থ্যসেবা		
স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়	হ্যাঁ	না
স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে এসে ডাক্তারকে পাওয়া যায় কিনা	৭৩.১	২৬.৯
স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে আসার পর প্রয়োজনীয় সেবা পেয়েছেন কিনা	৭৬.৯	২৩.১

ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারদের উপস্থিতি এবং তাদের সেবার মান নিয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসা রোগীদের মতামত নেয়া হয়েছে। নিরীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বেশিরভাগ রোগী অর্থাৎ ৭৩.১ শতাংশ বলেছেন তারা স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে এসে ডাক্তারকে ঠিকমত পান এবং বাকিরা বলেছেন যে তারা তাদেরকে ঠিকমত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পান না। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসার পর প্রয়োজনীয় সেবাও তারা ডাক্তারদের কাছ থেকে পান যা ৭৬.৯ শতাংশ রোগী উল্লেখ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা নিতে আসা রোগীরা সকলেই দরিদ্র জনগোষ্ঠী। তারা হাসপাতালে এমবিবিএস ডাক্তার না মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট সেবা দিচ্ছে এ বিষয়ে খুব একটা জানে না। বেশিরভাগ পর্যবেক্ষণেই দেখা গেছে, হাসপাতালে ডাক্তাররা অবস্থান করেন না। মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্টই স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কাজ করছে। দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট দিয়েই চলছে চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম। স্বাস্থ্যসেবা রোগীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, প্রয়োজনীয় সেবা বলতে তারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে ডাক্তার তাদের কথা শুনেছেন কিনা, হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে ঔষধ পেয়েছেন কিনা-এ বিষয়গুলোই বুঝিয়েছেন।

চার্ট ২ঠ: ইউনিয়ন হাসপাতালে সেবা পাওয়ার জন্য কোনও ফি দিতে হয় কিনা

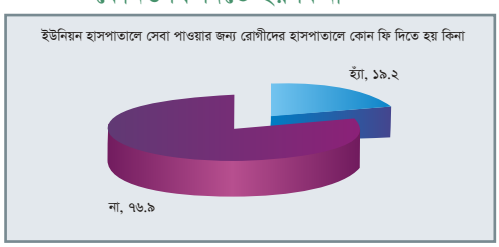

ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রাপ্তির জন্য কোনও প্রকার ফি না দেয়ার কথা থাকলেও নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১৯.২% রোগী বলেছেন, সেবা প্রাপ্তির জন্য তাদেরকে ফি দিতে হয়েছে।

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার সরুলিয়া ইউনিয়নের ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এমবিবিএস ডাক্তার সমীর কুমার দাস বলেন, স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে যে সেবা প্রদান করা হয় তা জনগণেল জন্য পর্যাপ্ত নয়। বাজেট বরাদ্দ ও পর্যাপ্ত ঔষধ বরাদ্দ না থাকায় জনগণের চাহিদা পূরণ করা যায় না। চিকিৎসক হিসাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সপ্তাহে ১দিন কমিউনিটি ক্লিনিকে যেয়ে রোগীদের সেবা দিতে হয়। (সূত্র: সাতক্ষীরা জেলা সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন)

ইউনিয়ন পরিষদের স্বাস্থ্যবিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে যাদের নিয়মিত ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন ও স্বাস্থ্যসেবা

টেবিল: ২.১০

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা			
স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়	স্থানীয় প্রতিনিধির উত্তর (%)		
	হ্যাঁ	না	জানা নেই
স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা নিয়মিত হয় কিনা	২০.০	৭৩.৩	৬.৭

সঠিকভাবে হচ্ছে তা পরিবীক্ষণ করার কথা। নিয়ম অনুযায়ী স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রতি মাসে একবার কথা থাকলেও বাস্তবে স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা হয় না। ৭৩.৩ শতাংশ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিটির সদস্য বলেন, সভা নিয়মিত হয় না এবং ৬.৭ শতাংশ সদস্য এ বিষয়ে কিছু জানেন না উল্লেখ করেন।

নিয়ম অনুযায়ী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের এ ব্যাপারে তদারকি করার নিয়ম থাকলেও ৬০ শতাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা বলেছেন তারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঔষধ বিতরণ বিষয়ে কিছু জানেন না। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ দাবি করেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র যতটুকু সেবা প্রদানের সুযোগ আছে জনগণ সেগুলো ঠিকমতোই পায়। কিন্তু রোগী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে জানা যায়, ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতালে এমবিবিএস ডাক্তার ঠিকমতো থাকে না এবং তারা গ্রামে অবস্থানও করেন না। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মূলত স্বাস্থ্য সহকারী দিয়েই চলে চিকিৎসা সেবা। এক্ষেত্রে তেমন কোনও মনিটরিং নেই বলে তারা উল্লেখ করেন।

চার্ট ২ড: স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে স্থানীয় সরকারের তদারকি

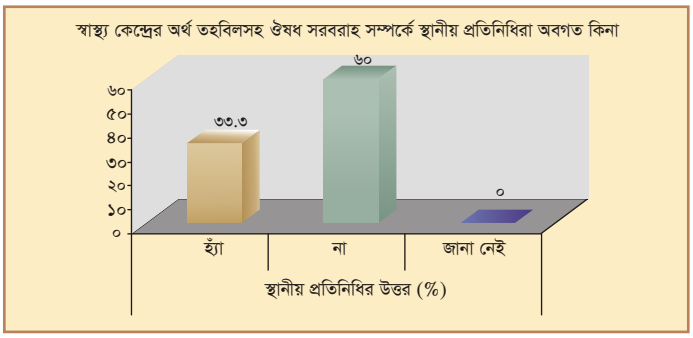

টেবিল: ২.১১

কমিউনিটি ক্লিনিকে কমিউনিটি গ্রুপের মাসিক সভা সংক্রান্ত তথ্য				
কমিউনিটি গ্রুপের সভা	হয় না	১ বার	২ বার	৩ বার
কমিউনিটি গ্রুপের সভা মাসে কয় বার হয়	৫৮.৮	৪১.২	০.০	০.০

কমিউনিটি ক্লিনিকে কমিউনিটি গ্রুপের মাসিক সভা সরকারের দেয়া নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর পর হওয়ার নির্দেশ আছে। নিরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অর্থাৎ ৫৮.৮ শতাংশ পরিবার কল্যাণ সহকারী/স্বাস্থ্য সহকারী বলেছেন কমিউনিটি ক্লিনিকে কমিউনিটি গ্রুপের কোনও মাসিক সভা হয় না। আবার ৪১.২ শতাংশ পরিবার কল্যাণ সহকারী/স্বাস্থ্য সহকারী বলেছেন উক্ত সভা মাসে ১ (এক) বার হয়।

টেবিল: ২.১২

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সেবা সম্পর্কে স্থানীয় প্রতিনিধি প্রদত্ত তথ্য			
স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়	স্থানীয় প্রতিনিধির উত্তর (%)		
	হ্যাঁ	না	জানা নেই
স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সেবার মান বাড়াতে স্থানীয় সরকার থেকে তদারকি করা হয় কিনা	৪৬.৭	৫৩.৩	০.০

স্থানীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র মনিটরিং এর ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত। এ বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চাইলে ৩৩.৩০ শতাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি মনে করেন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র মনিটরিং এর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ভূমিকা নেই। এছাড়া ১৩.৩ শতাংশ তাদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু জানেন না।

চার্ট ২ঢ: ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র মনিটরিং এ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ভূমিকা

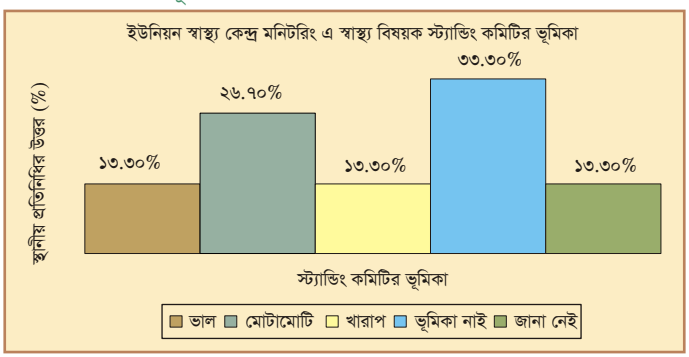

স্থানীয় সরকার থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্র মনিটরিং ব্যবস্থা ভাল বা শক্তিশালী না হবার কারণে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে সেবার মান খুব ভাল বলা যায় না। তাই নিরীক্ষায় পাওয়া গেছে ৫৩.৩ শতাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা বলেছেন যে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সেবার মান বাড়াতে স্থানীয় সরকার থেকে কোন রকম তদারকি করা হয় না। আবার তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততাও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে খুব ভাল না বাস্তবিক পক্ষে।

টেবিল: ২.১৩

কমিউনিটি ক্লিনিকে সাপ্তাহিক সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য						
ক্লিনিক চালু থাকা	পরিবার কল্যাণ সহকারী/স্বাস্থ্য সহকারীর উত্তর (%)					
	১ দিন	২ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৫ দিন	৬ দিন
সপ্তাহে কয়দিন সেবা দেয়া হয়	০.০	২৯.৪	২৩.৫	৫.৯	০.০	৪১.২

তৃণমূল পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোও সপ্তাহে ৬দিন খোলা থাকার কথা থাকলেও নিরীক্ষায় পাওয়া তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, ৪১.২ ভাগ পরিবার কল্যাণ সহকারী/স্বাস্থ্য সহকারী বলেছেন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো সপ্তাহে ৬ দিন খোলা থাকে এবং ২৯.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, সপ্তাহে দুইদিন খোলা থাকে। নাগরিক প্রতিনিধিদের সাথে করা এফজিডির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিক ২/৩দিন খোলা থাকে। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ঔষধ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। তারপরও কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রতি সাধারণ দরিদ্র রোগীরা খুশি। চুয়াডাঙ্গা জেলার জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের এক রোগীর ভাষ্যমতে "দেখা যাচ্চে ছোট খাট সমস্যা দেখা দিলি দুরে যাতি হবে বুইলে কুনো যাগাই যাতাম না, বড় জগায় যায়ে হাজার হাজার টাকা ফুরিয়ে যাইত কিন্তু রোগ সাইরত না।"

চার্ট ২ণ: স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণে সুপারিশ

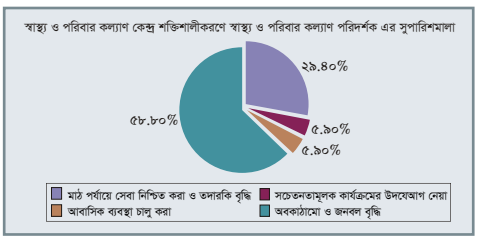

ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণে মাঠপর্যায়ের সেবা নিশ্চিতকরা ও যথোপযুক্ত তদারকি বৃদ্ধি করা, ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য আবাসন সুবিধা বাড়ানো, সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং অবকাঠামো ও জনবল বৃদ্ধি বিষয়ে সুপারিশ করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক।

২.১.৬. সরবরাহকৃত ঔষধ ও খাবার

ঔষধ: স্বাস্থ্যসেবার জন্য জরুরি ঔষধ সরবরাহ গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী প্রতিটি হাসপাতালে বহিঃর্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগে ঔষধের তালিকা থাকা বাধ্যতামূলক। সরকার থেকে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর জন্য বিভিন্ন আইটেমের অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সরবরাহ করে থাকে। সিটিজেন চার্টার অনুসারে প্রতিটি হাসপাতালে ঔষধের তালিকা রয়েছে এবং তা টানিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক। বাৎসরিক বরাদ্দ অনুসারে জেলা সদর হাসপাতাল,উপজেলা সদর হাসপাতাল এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে ঔষধ সরবরাহ করা হয়।

টেবিল: ২.১৪

হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য		
হাসপাতালে ঔষধের তালিকা	ফার্মাসিস্ট এর উত্তর (%)	
	হ্যাঁ	না
হাসপাতালে কোন ঔষধের তালিকা আছে কিনা	১০০	০
ঔষধ প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধায় পড়েন কিনা	৮০	২০

সামাজিক নিরীক্ষা হতে পাওয়া গেছে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালের ১০০ ভাগ ফার্মাসিস্টরাই বলেছেন তাদের কাছে ঔষধের নির্দিষ্ট তালিকা আছে। ঔষধ প্রদানের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা অসুবিধায় পড়েন বলে ৮০ শতাংশ ফার্মাসিস্ট উল্লেখ করেন। ঔষধ বিতরণের ক্ষেত্রে সমস্যার মধ্যে রোগী অনুযায়ী ঔষধ বরাদ্দ না থাকা, অঞ্চলভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী ঔষধ বরাদ্দ না থাকা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি বিষয়কে উল্লেখ করেন।

চার্ট ২৩: হাসপাতাল থেকে ঔষধ সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্য

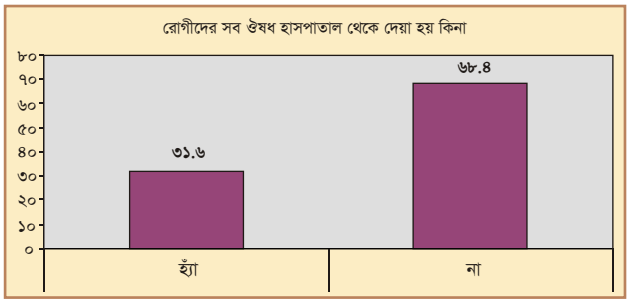

জেলা হাসপাতালের ৬৮.৪ শতাংশ বহিঃর্বিভাগের রোগী বলেছেন চিকিৎসার জন্য সব ঔষধ তারা হাসপাতাল থেকে পায় না। এজন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাজেট ঘাটতি এবং অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছেন। আবার জরিপে অংশগ্রহণকারী ১০০ ভাগ অন্তঃবিভাগের রোগীরাও বলেছেন যে, তারা ওয়ার্ডে থাকাকালীন বেশিরভাগ ঔষধ তাদের বাহিরে থেকে কিনেছেন। হাসপাতালগুলোতে ঔষধের সঠিক ব্যবহার না হওয়া, যোগান কম থাকা , ঔষধ পাচার ও ডাক্তারদের সাথে মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভদের দৌরাত্ব ইত্যাদিকে কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন। রোগীরা আরও উল্লেখ করেন, অনেকসময় ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশনে বা ব্যবস্থাপত্রে হাসপাতালে যে ঔষধগুলো থাকে সেগুলো না লিখে অন্য কোম্পানীর ঔষধ লেখে। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভরা (এমআর) ডাক্তারের কক্ষ থেকে বের হওয়ার পর তাদের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে দেখে তাদের কোম্পানীর ঔষধ ব্যবস্থাপত্রে লেখা হয়েছে কি না? রোগীরা বলেন, এ পরিস্থিতে তাদের

টেবিল: ২.১৫

থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঔষধের সংস্থান		
	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার উত্তর (%)	
থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন বিষয়	হ্যাঁ	না
হাসপাতলে তালিকাভুক্ত যে ঔষধ আসে সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিনা	৩১.২৫	৬৮.৭৫

বাধ্য হয়ে বাড়তি ঔষধ বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে। রোগীরা উল্লেখ করেন, এতে করে প্রতারিত হচ্ছেন। হেলথ ওয়াচ প্রতিবেদন ২০০৯-এর মধ্যেও এমআরদের কার্যক্রমকে আগ্রাসী বলে উল্লেখ করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ১৯৯৪ সালে মোট ব্যবস্থাপত্রের ৫ শতাংশে একটির বেশি ঔষধ লেখা হয়েছিল, ২০০৯ সালে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ শতাংশে। গবেষণায় আরও দেখা যায় গত ১৫ বছরে এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ।[৬] রোগীরা উল্লেখ করেন, এমআরদের চাপে পড়ে ডাক্তাররা অনেকসময় ব্যবস্থাপত্রে বেশি ঔষধ লিখছেন- এ বিষয়ে কোনও মনিটরিং নেই।

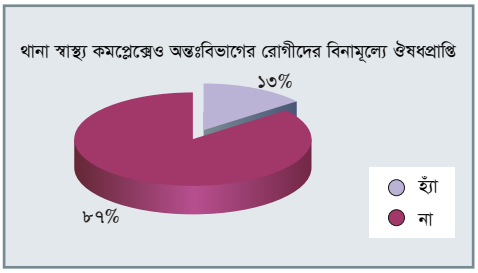

থানা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতেও ঔষধের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নেই। থানা পর্যায়ে বছরে যে টাকা ঔষধের জন্য বরাদ্দ রাখা হয় যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। আবার দেখা যায় হাসপাতালগুলোতে একদিকে ঔষধের সংকট অন্যদিকে কিছু ঔষধ কেন্দ্র থেকে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে যেগুলোর চাহিদা উল্লেখিত হাসপাতালে নেই। ফলে দেখা যায় ঔষধগুলো ফেরত দিতে হয়। নিরীক্ষার তথ্যানুযায়ী থানা হাসপাতালগুলোতে ছোট খাটো অপারেশন করা হলেও রোগীদের গজ-ব্যান্ডেজসহ সব ধরনের ঔষধ বাইরে থেকে কিনতে হয়। সরবরাহ কম থাকার কারণে রোগীরা ঠিকমত ঔষধ পায় না। জরিপে ৬৮.৭৫ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বলেছেন, থানা হাসপাতলে তালিকাভুক্ত যে সকল ঔষধ আসে সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না। যথেষ্ট যোগান ও বাজেট বরাদ্দ কম হওয়ার কারণে তারা ঔষধ সরবরাহ করতে পারে না।

থানা হাসপাতালে ঔষধ এর প্রতুলতা নিয়ে হাসপাতালের বহিঃবিভাগ ও অন্তবিভাগের রোগীরা অসন্তুষ্ট। নিরীক্ষায় বহিঃবিভাগের ৬২.৫ শতাংশ রোগী এবং অন্তঃবিভাগের ৮৭.৫ শতাংশ রোগী বলেছেন, হাসপাতালে ঔষধের সঠিক যোগান থাকলেও এর তারা হাসপাতাল থেকে ঔষধ থেকে পান না।

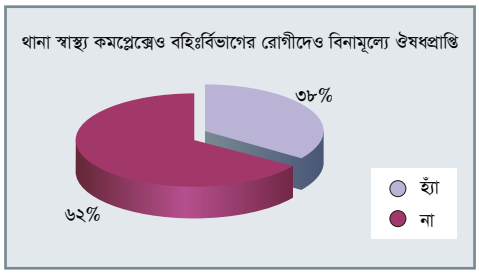

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষগুলো স্বাস্থ্যসেবা থেকে বেশি বঞ্চিত। অথচ তৃণমূল পর্যায়েই স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধাগুলো বেশি থাকা দরকার। কারণ তারা আর্থিক এবং অন্যান্য প্রতিকূলতার কারণে শহরে এসে স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারে না। তাই এ পর্যাযে সকলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দে তাই ইউনিয়ন পর্যায়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিৎ।

সামাজিক নিরীক্ষার তথ্যানুযায়ী বেশিভাগ ডাক্তার (৮২.৪%) বলেছেন, স্থানীয় রোগীর চাহিদা অনুযায়ী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঔষধের পরিমাণ পর্যাপ্ত না। সরকার প্রতিবছর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য যে ঔষধ বরাদ্দ দেয় তা যথেষ্ট নয়। নাগরিক প্রতিনিধি এবং স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্টদের মতে, ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতালে বেশি করে ঔষধ বরাদ্দ দেয়া উচিত।

তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছানোর জন্য সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক করেছেন। কিন্তু অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের কারণে এখানকার সেবা প্রদানকারীরা চাহিদা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করাসহ সকল

[৬] হেলথ ওয়াচ প্রতিবেদন ২০০৯

চার্ট ২থ: স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী ঔষধ পর্যাপ্ত কিনা

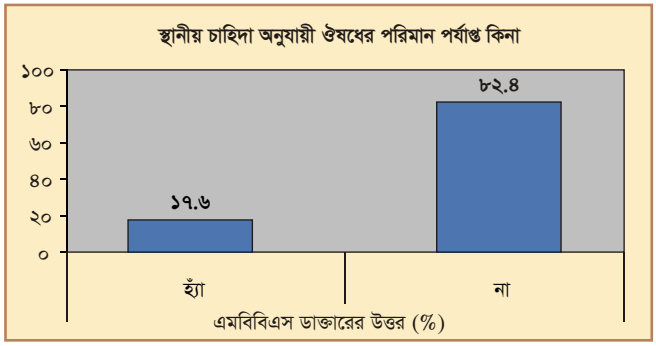

ঔষধপত্র বিতরণ করতে পারে না। তারপরও সামাজিক নিরীক্ষায় পাওয়া গেছে ৯৪.১ শতাংশ পরিবার কল্যাণ সহকারী বা স্বাস্থ্য সহকারী বলেছেন ক্লিনিক থেকে ঔষধ ও চিকিৎসা উপকরণ সঠিকভাবে বিতরণ করা হয় বলে উল্লেখ করেন। বরগুনা জেলার বরগুনা সদর উপজেলার ১নং বদরখালী ইউনিয়নের পাতাকাটা কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিবার কল্যাণ সহকারী কনিকা রানী (৪০) ঔষধ ও উপকরণ বিতরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখানে শুধুমাত্র প্যারাসিটামল, হিস্টাসিন, জন্ম বিরতীকরণ ঔষধ ও ভিটামিন ক্যাপসুল বিতরণ করা হয়। এখানে ডেলিভারী কীট, একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী, একজন অফিস সহকারী প্রয়োজন। বিনামূল্যে পর্যাপ্ত সেবা দেওয়ার জন্য লোকবল বৃদ্ধি, ঔষধের পরিমাণ বৃদ্ধি ও উন্নত উপকরণ সরবরাহের সুপারিশ করেন। কিন্তু রোগীরা এ বিষয়ে বলেন, তারা কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ঠিকমত পান না।

খাবার: জেলা সদর হাসপাতালে শয্যা হিসেবে প্রতিদিন তিনবেলা খাবারের জন্য ১৫০ টাকা করে বরাদ্দ থাকলেও সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিদিনের খাবারের জন্য ৭৫ টাকার বেশি খরচ করা যাবে না। ফলে দেখা যায় শয্যা হিসেবে রোগী প্রতি দৈনিক খাবারের জন্য ৭৫ টাকা করে বরাদ্দ রয়েছে। তালিকা অনুয়ায়ী সকালে কলা, পাউরুটি, ডিম এবং দুপুর ও রাতে সব্জি, মাছ/মাংস, ডাল ও ভাত সরবরাহ করার কথা। হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের রোগী ভর্তি হলেও দেখা যায়, সকলের জন্য একই খাবার দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া খাবারের মান মানসম্মত নয় বলে রোগীরা বলেন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় রান্নাঘরের মান মোটেই স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশ সম্মত নয়। জেলা হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিন যে পরিমাণে রোগী ভর্তি হয় সে অনুযায়ী খাবারের বরাদ্দ অপ্রতুল। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের পরিচালক জানান, ৭৫ টাকা দিয়ে রোগীর ক্যাটাগরি অনুযায়ী মানসম্মত খাবার সরবরাহ করা সম্ভব নয়। প্রতিদিন হাসপাতালে শয্যার চেয়ে দ্বিগুণ রোগী থাকে। ফলে দেখা যায়, শয্যা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ১৫০ টাকা দিয়ে দ্বিগুণ রোগীদের খাবারের সংস্থান করা হয়। বর্তমানে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতির জন্য রোগীদের খাবারের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে মানসম্মত খাবারের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেন। খাবারের মান নিয়ে রোগীরা মোটেই সন্তুষ্ট নয়। ময়মনসিংহ জেলা সদর হাসপাতালে অপারেশনের রোগী তালেব আলী বলেন, রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত খাবার হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা খাচ্ছেন। অথচ তাদের জন্য রান্না করা খাবার আর রোগীদের জন্য রান্না করা খাবার এক নয়। খাবারের মান সম্পর্কে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের রোগী পরিমল দাস বলেন, ওয়ার্ডে খাবারের মান ভাল না। ভর্তির দশদিনের মধ্যে একদিন খাবার পেয়েছে। সকালে ১টি কলা ও ১টি রুটি ও ১টি ডিম দেয়া হয়। দুপুরে ২পিছ আলু ও ১পিছ ছোট মাংস দিয়ে একপ্লেট ভাত দেয়া হয়। একই হাসপাতালের রোগী মোসলেমা খাতুন বলেন, তিনি হাসপাতালের খাবার খান না, এই খাবার খেলে আরও অসুস্থ্য হয়ে যান বিধায় বাসা থেকে এনে খাবার খান। রোগীদের মতে, খাবারের মান বিষয়ে নজরদারি থাকা দরকার।

তবে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে খাবার বিষয়ে ভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা বলেন, এখানে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল থাকলেও প্রতিদিন গড়ে ১৫-২০ জন রোগী ভর্তি থাকে। বেশিরভাগ রোগী স্বল্পকালীন চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের শরণাপন্ন হন। ফলে দেখা যায় খাবারের জন্য সরকারের বরাদ্দকৃত যে অর্থ সেটি তারা পুরোপুরি খরচ করতে পারে না। প্রায়ই ফেরত দিতে হয়। তিনি সুপারিশ করেন, থানা পর্যায়ে খাবারের জন্য অর্থ কম বরাদ্দ রেখে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের জন্য বেশি বরাদ্দ রাখা দরকার। ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খাবারের জন্য কোনও বরাদ্দ রাখা হয় না।

২.১.৭ ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ানদের দক্ষতা ও সেবা

জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে গুণগত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির জন্য দক্ষ ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ান এর গুরুত্ব অপরিসীম।

টেবিল: ২.১৬

হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের রোগী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য		
হাসপাতালের সেবা সংক্রান্ত বিষয়	রোগীর উত্তর (%)	
	হ্যাঁ	না
ওয়ার্ডে ডাক্তার, নার্স নিয়মিত আসেন কিনা	৮৪.২	১৫.৮
ওয়ার্ডে ডাক্তার, নার্স রাতে অবস্থান করেন কিনা	৮৪.২	১৫.৮

জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে হাসপাতালের নির্দিষ্ট সময় পর পর ডাক্তার, নার্স ও ওয়ার্ডবয়দের পরিভ্রমণ করার জন্য সঠিক নির্দেশনা থাকলেও অনেকক্ষেত্রে তারা ঠিকমত ওয়ার্ডগুলো পরিদর্শন করে না। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ১৫.৮ শতাংশ অন্তঃবিভাগের রোগী বলেছেন হাসপাতালের ওয়ার্ডে ডাক্তার ও নার্সরা নিয়মিত আসেন না এবং রাতে অবস্থান করেন না।

চার্ট ২দ: হাসপাতালে ডায়াগনসিস অবস্থা

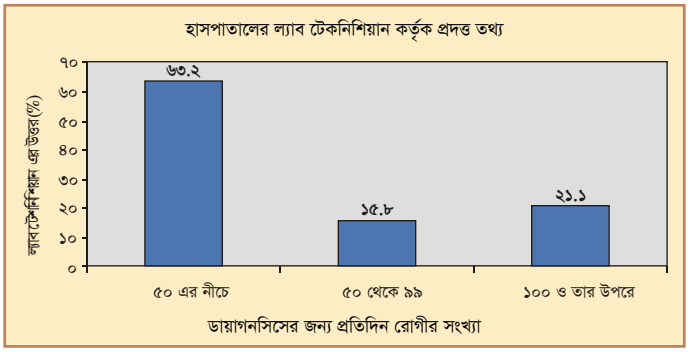

থানা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতেও ডাক্তার, নার্স ও ওয়ার্ডবয়রা নিয়মিত ও সঠিকভাবে ডিউটি পালন করে না বলে অন্তঃবিভাগের রোগীরা উল্লেখ করেন।

জেলা হাসপাতালের ৬৩.২ শতাংশ ল্যাব টেকনিশিয়ানরা বলেছেন তারা দিনে ৫০ জনের কম সংখ্যক রোগী ডায়াগনসিস করে থাকেন। হাসপাতালে ভাল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকার কারণে রোগী অনুপাতে ডায়াগনসিস এর পরিমাণ কম বলে তারা উল্লেখ করেন।

টেবিল: ২.১৭

জেলা সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য		
সদর হাসপাতালের সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়	সিভিল সার্জনের উত্তর (%)	
	হ্যাঁ	না
জেলায় সার্বিক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আপনাকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কিনা	৭৭.৮	২২.২

জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে সিভিল সার্জনদের ভাল সেবা প্রদানের পরিবেশ নিশ্চিত কবা সরকার ও তার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও বিবেচনার বিষয়। কিন্তু নিরীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে খুব অল্প সংখ্যক অর্থাৎ মাত্র ২২.২ শতাংশ সিভিল সার্জন বলেছেন যে, হাসপাতালের সার্বিক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাদের কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না, কিন্তু ৭৭.৮ শতাংশ সিভিল সার্জন বলেছেন, সেবাপ্রদানে তাদের নানামুখী সমস্যায় পড়তে হয়।

২.১.৮ বরাদ্দকৃত বাজেট

একটি দেশের পর্যাপ্ত ও গুণগত স্বাস্থ্যসেবা, দরিদ্রবান্ধব স্বচ্ছ নীতি প্রণয়ন এবং পর্যাপ্ত জনবল এ খাতে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু বাজেট প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাজেট বরাদ্দের সাথে সরকারের সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং জনগণের চাহিদা প্রাধান্য পাওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে সবগুলো বিষয়কে বিবেচনা করা হয় না। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যখাতের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া আমলাতান্ত্রিক এবং অগণতান্ত্রিক যেখানে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের কোনও সুযোগ নেই বলেই চলে।

চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৮,১৪৯ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬.২% এবং জিডিপির ১%। বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছরে যেখানে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছিল ৬,৯৮০ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬.১%। অর্থাৎ বিগত বছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র ০.১%, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মাঝারি মানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য জিডিপির ৫% বরাদ্দ প্রয়োজন। স্বাস্থ্যখাতের এই বরাদ্দের সিংহভাগ খরচ হয় বেতনভাতা পরিশোধ করতে। স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন স্তর রয়েছে। জেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে স্বাস্থ্যসেবার জন্য বাজেট বরাদ্দ শয্যা এবং থোক বরাদ্দ হিসেবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় শয্যা হিসেবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে থোক বরাদ্দ দেয়া হয়।

সামাজিক নিরীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, জেলা সদর হাসপাতালে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। অনুন্নয়ন বা রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের খাতগুলো হলো: বেতনভাতা, এমএসআর (মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল রিক্যুইজিট), রোগীর জন্য খাবার, থোক বরাদ্দ, কন্টিনজেন্সি এবং অবকাঠামো। অন্যদিকে উন্নয়নখাতে অবকাঠামো এবং বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। বেশিরভাগ উন্নয়ন বরাদ্দ স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনায় গৃহীত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিবছর দেখা যায় এমএসআর খাতে বরাদ্দ হয় (১বেড*১৮৮.৩৫টাকা প্রতিদিন * ৩০দিন*১২ মাস) হিসেবে। এমএসআর খাতে যে বরাদ্দকৃত টাকা সরকারের নীতিমালা অনুসরণ করে খরচ করা হয়। যেমন: মোট টাকার

- ঔষধ ৬০%
- সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ১৫%
- প্যাথলজি টেস্টের জন্য কেমিক্যাল রিজেন্ট ৫%
- গজ, ব্যান্ডেজ, তুলা ৬%
- ফার্নিচার ২%
- লিনেন আইটেম যেমন: বেডশিট, বালিশ, বালিশের কভার, ম্যাট্রেজ ইত্যাদি) ৬%
- অক্সিজেন গ্যাস ৫%
- বিভিন্ন জায়গায় মালামাল সরবরাহ ১%

নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে এমএসআর খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ হচ্ছে ঔষধ বাবদ। প্রতিবছর যে পরিমাণ ঔষধ কেনা হয় তার ৭০ ভাগ ঔষধ কিনতে হয় সরকারি ঔষধ কোম্পানী Essential Drug Company Limited (EDCL) থেকে এবং বাকী ৩০ভাগ ঔষধ কেনা হয় ওয়ার্ডের চাহিদা অনুযায়ী। ঔষধ কেনার জন্য স্থানীয় এমএসআর কমিটি টেন্ডারের মাধ্যমে পিপিআর (পাবলিক প্রোকিওরমেন্ট রেগুলেশন) নীতিমালা অনুসরণ করে কিনে থাকে। নতুন এই আইনের একটি দুর্বলতা হচ্ছে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও কোনও কন্ট্রাক্টর কর্মাদেশ পেতে পারে। এরফলে দেখা যায় যে, কিছু অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে কাজ পেয়ে যাচ্ছে। ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালের স্টোরকীপার মনে করেন, মেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ কাউকে কর্মাদেশ দেয়া ঠিক নয়।

হাসপাতালে অনুন্নয়ন বা রাজস্ব বাজেটের একটি অংশ জেলা হাসপাতালে দেয়া হয় থোক বরাদ্দ হিসেবে। এই থোক বরাদ্দের পরিমাণ একেক বছর একেক রকম। কোনও বছর বাড়ে আবার কোনও বছর কমে। থোক বরাদ্দের টাকাও শয্যা হিসেবে দেয়া হয়। থোক বরাদ্দ খরচের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করে খরচ করতে হয়। যেমন:

-ঔষধ ৩০%
-সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ৩০%
-গজ, ব্যান্ডেজ, তুলা ১০%
-ফার্নিচার ২%
-লিনেন আইটেম যেমন: বেডশিট, বালিশ, বালিশের কভার, ম্যাট্রেজ ইত্যাদি) ১০%
-এক্সরে, ইসিজি পেপার ৫%
-অন্যান্য ৫%

জেলা সদর হাসপাতালে খাবারের জন্য প্রতিবেড*১৫০টাকা হারে বরাদ্দ দেয়া হয়। তবে সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী তিনবেলা খাবারের জন্য ৭৫টাকার বেশি খরচ করা যাবে না। সে হিসেবে রোগী প্রতি দৈনিক খাবারের জন্য বরাদ্দ ৭৫টাকা। এছাড়া কন্টিনজেন্সি, বেতনভাতা, বোনাস ও ভ্রমণখাতে টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

উপজেলা সদও হাসপাতালে রাজস্ব বাজেটের মধ্যে দেখা যায় এমএসআর খাতে শয্যা প্রতি বছরে ২৫,০০০টাকা (১ বেড*২৫,০০০) করে বরাদ্দ দেয়া হয়। হাসপাতালে এই টাকা সরাসরি দেয়া হয় না। আগে ঔষধ জেলা সিভিল সার্জন অফিস থেকে টেন্ডারের মাধ্যমে কেনা হলেও এখন এটি সরাসরি সেন্ট্রাল মেডিসিন স্টোর ডিপার্টমেন্ট (CMSD) থেকে জেলা সিভিল সার্জন অফিসে পাঠানো হয়। সিভিল সার্জন অফিস থেকে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিতরণ করে থাকে। উপজেলা হাসপাতালে ১ থেকে দেড় লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দ হিসেবে দেয়া হয়। এই বরাদ্দ একেক বছর একেক রকম হয়। এছাড়া শয্যা হিসেবে ১*৭৫ টাকা রোগীর খাবার, কন্টিনজেন্সি মাসে ৪-৫ হাজার টাকা, বেতনভাতা, উৎসব ভাতা এবং ভ্রমণ ভাতা বরাদ্দ দেয়া হয়। উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ পরিবার পরিকল্পনা শাখা থেকে খরচ করা হয়।

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রতিবছর এমএসআর খাতে ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

চার্ট ২ধ: বাজেট বরাদ্দ যথেষ্ঠ কিনা

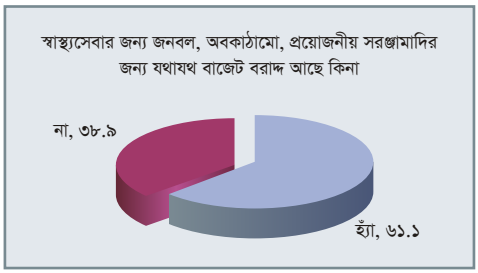

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান জেলা সদর হাসপাতালে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজীয় জনবল, অবকাঠামো, সরঞ্জামাদির জন্য যথাযথ বাজেট বরাদ্দ না থাকার কারণে সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভাল সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। নিরীক্ষার তথ্যানুযায়ী ৩৮.৯ শতাংশ জেলা সিভিল সার্জন মনে করেন হাসপাতালে জনবল, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির জন্য বাজেট বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়।

উপজেলা হাসপাতালগুলোতেও উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজীয় জনবল, অবকাঠামো এবং সরঞ্জামাদি ক্রয় ও মেরামতের জন্য যথাযথ বাজেট বরাদ্দ না থাকার কারণে মানসম্মত সেবা প্রদান করা সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা। থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজীয় জনবল, অবকাঠামো, সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির জন্য যথাযথ বাজেট বরাদ্দ নেই।

২.১.৯. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সার্বিক পরিবেশ

হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোগ-জীবানুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা এবং সুস্থ পরিবেশের জন্য টয়লেট, মেঝে, শয্যা এবং আশে-পাশের নর্দমাগুলোর পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি। নিরীক্ষার মাধ্যমে জরিপে পাওয়া গেছে জেলা হাসপতালের সকল অন্তঃবিভাগের রোগী বলেছেন হাসপাতালের টয়লেটগুলো মোটেই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলেন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি রোগী এবং রোগীর সাথে যারা তাদের তাদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। রোগীদের অভিযোগ সুইপার ঠিকমতো টয়লেটগুলো পরিস্কার করে না এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীরাও নিয়মিত কাজ করেন না। এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেন, পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মীর অভাব এবং সুইপার হিসেবে বর্তমানে হরিজনদের নিয়োগ কম হওয়ায় ফলে অন্য সম্প্রদায় এই কাজটি করতে স্বাচ্ছন্দবোধ না করায় টয়লেটগুলো নিয়মিত ভালোভাবে পরিস্কার করে না। তারা মনে করেন, পরিচ্ছন্নতা কর্মী বাড়ানো এবং সুইপার হিসেবে হরিজনদেরই নিয়োগ দরকার।

টেবিল: ২.১৮

হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের রোগী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য		
হাসপাতালের সেবা সংক্রান্ত বিষয়	রোগীর উত্তর (%)	
	হ্যাঁ	না
টয়লেটগুলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কিনা	০.০	১০০.০

২.১.১০. সেবা গ্রহীতাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত

জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতাগণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা ও মতামত সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে তোলে আনা হয়েছে।

নিরীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মাত্র ২১.১% রোগী সেবার মান ভালো এবং ১৫.৮ শতাংশ হাসপাতালে সেবার মান মোটেই ভালো না বলে উল্লেখ করেন।

চার্ট ২ন: হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের রোগী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য

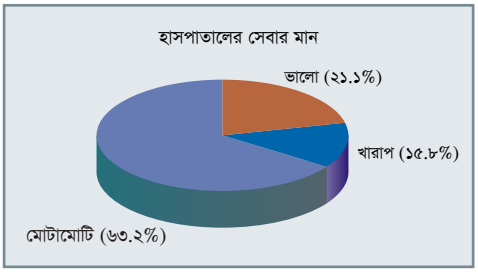

২১.১ শতাংশ রোগী সেবার মান ভালো বলে উল্লেখ করলেও হাসপাতালের সার্বিক সেবায় (ডাক্তারের ব্যবহার, ঔষধ, খাবার, নার্সদের সেবা, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি) তারা কেউই পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন। জেলা সদর হাসপাতালের ৫৭.৯ শতাংশ রোগী তাদের মোটামোটি সন্তুষ্টতার কথা প্রকাশ করেছেন এবং ৪২.১ শতাংশ বলেছেন তারা হাসপাতালের সেবায় মোটেই সন্তুষ্ট না।

চার্ট ২প: হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের রোগী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য

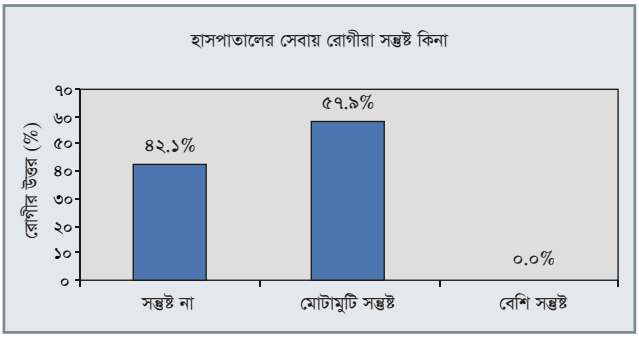

জেলা হাসপাতাল থেকে উন্নত সেবার জন্য দূর দূরান্ত থেকে রোগীরা এসে ভিড় করে। ডাক্তার দেখানোর জন্য প্রথমে তাদের টিকেট কাটার জন্য দীর্ঘ লাইন পাড়ি দিয়ে আবার ডাক্তার দেখানোর জন্যও তাদের দীর্ঘ লাইন পাড়ি দিতে হয়। তারপরও দেখা যায় অনেকসময় ডাক্তারের দেখা পান না। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রোগী দেখার নির্ধারিত সময়

সদর হাসপাতালে টিকিটের জন্য মহিলাদের দীর্ঘ লাইন

পার হয়ে যাওয়ার ডাক্তার চলে যায়। রাজশাহী সদর হাসপাতালের বহির্বিভাগের রোগী ফাতেমা বেগম (৪০) বলেন, আমরা গরিব মানুষ। অসুখ-বিসুখে সরকারি হাসপাতালে আসি। ক্লিনিকে যাওয়ার মতো কোনও ক্ষমতা নেই। রোগীরা বহির্বিভাগে সেবার মান বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করেন।

তালা হাসপাতালের বহিঃবিভাগের রোগী নুরজাহান বেগমের অভিমত

তালা উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মোকছেদ আলীর স্ত্রী নুরজাহান বেগম (৫০) ২ আগষ্ট হাত ভাঙ্গা সমস্যা নিয়ে আসেন তালা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সকাল সাড়ে আটটায়। সকাল ১০টা পর্যন্ত কোন ডাক্তারকে তিনি পাননি। পরে ডাক্তার এলে তিনি সেবা পেয়েছেন। তবে তাকে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে বেশিরভাগ ঔষধ বাইরে থেকে কেনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। হাসপাতাল থেকে শুধুমাত্র ব্যাথার ঔষধ দেয়া হয়েছে। তিনি ৩ টাকা দিয়ে টিকিট কিনে ডাক্তার দেখিয়েছেন।

থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অন্তঃবিভাগের রোগীদের কেউই হাসপাতালের সেবায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট না। ৪৩.৭৫ শতাংশ মোটামুটি সন্তুষ্ট হলেও ৫৬.২৫ শতাংশ রোগী একেবারেই সন্তুষ্ট না।

কেইস স্টোরি:

হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবায় সন্তুষ্ট নন আব্দুল লতিফ

টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার নারান্দিয়া ইউনিয়নের কুচুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল লতিফ। বয়স ৩৬। পেশায় একজন কলার ব্যাপারী। ১০ই আগস্ট'১০ মঙ্গলবার ট্রাকে মালামাল আনতে গিয়ে টাঙ্গাইল কালিহাতি সড়কে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। ফলে পায়ে মারাত্মক আঘাত পান এবং পায়ের গোড়ালি ভেঙ্গে যায়। ঐদিনই টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি হন। পরে হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের পেইং বেডে স্থানান্তরিত হন। হাসপাতালে ভর্তির পর অপরিচিত একজন ব্যক্তি তাকে বলেন, 'আমার দুলাভাই এখানকার ডাক্তার। সামান্য কিছু টাকা দিলে ভাল চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করতে পারতাম।' অপরিচিত ব্যক্তির কথায় গুরুত্ব না দিয়ে তিনি এড়িয়ে যান। হাসপাতালের অন্তঃবিভাগে ভর্তি থাকাকালীন সময়ে আব্দুল লতিফের পায়ের

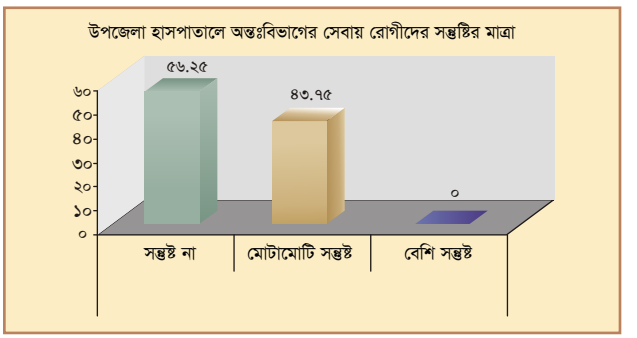

হাসপাতালের সেবায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হয়েও কোনও উপায় না থাকায় তারা সরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা নিচ্ছেন।

ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সেবা নিতে আসা রোগীদের মধ্যে ৬৯.২ শতাংশ সন্তুষ্ট বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাদের মতে,

টেবিল: ২.১৯

ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত অভিমত

স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়	রোগীর উত্তর (%)	
	হ্যাঁ	না
স্বাস্থ্য কর্মীদের ব্যবহারে আপনি সন্তুষ্ট কিনা	৬৯.২	৩০.৮

প্লাস্টারের যাবতীয় সামগ্রী তার আত্মীয়-স্বজন সরবরাহ করলেও তিনি ওয়ার্ডবয়কে অতিরিক্ত দুইশত টাকা দিতে বাধ্য হন। হাসপাতালে নির্ধারিত ফি দ্বারা তিনি বুকে, কোমর ও দুই পায়ে এক্সরে করেন। ১১ আগস্ট'১০ বুধবার রাতে ভিজিটিং আওয়ারে ডাক্তার রাউন্ডে আসে নি। তার চিকিৎসার যাবতীয় ঔষধপত্র বাইরে ফার্মেসি থেকে কেনা হয়েছে। হাসপাতালের ওয়ার্ডবয়রা রোগীদের আত্মীয়স্বজনদের সাথে গিয়ে তাদের পরিচিত ফার্মেসি থেকে ঔষধ কিনতে সুপারিশ করেন। ওয়ার্ডবয়দের সাথে গেলে ঔষধ কেনার সময় কোনও দামাদামি করা যায় না। তিনি জানান, হাসপাতালে ভর্তির একদিন পর থেকে হাসপাতালের সরবরাহকৃত খাবার পান। কিন্তু সেক্ষেত্রে খাবারের কথা জিজ্ঞেস করলে, 'সবুর করেন-দিচ্ছি, আপনার বাপের বাড়ির খানা নাকি চাইলেই পাওয়া যাবে...' এমন কুটুক্তি শুনতে হয় তার পরিবারের সদস্যদের। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেট না থাকায় অপ্রীতিকর ঘটনার স্বীকার হন তার পরিবারের নারী সদস্যরা। তাছাড়া হাসপাতালের ভবনে গোসল করার কোনও ব্যবস্থা নেই। ক্রমাগত লোডশেডিং-এ অস্থির ও অসুস্থ্য হয়ে পড়েন আব্দুল লতিফ। হাসপাতালে জেনারেটর থাকা সত্ত্বেও জেনারেটর ব্যবহার না করায় তীব্র গরমে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বিড়বিড় করে গালমন্দ করেন। এছাড়া প্রতিনিয়ত পানীয় জলের সমস্যাতো রয়েছেই। তিনি বলেন, গত তিনদিনে প্রায় ছয় হাজার টাকা খরচ করলেও আশানুরূপ চিকিৎসা সেবা পান নি। হাসপাতালে বিভিন্ন সমস্যায় তিনি আরও অসুস্থ্য বোধ করছেন।

স্বাস্থ্যসেবার জন্য তাদের মতো দরিদ্র মানুষের পক্ষে শহরে গিয়ে চিকিৎসা সেবা নেয়া সম্ভব নয়। এজন্য ইউনিয়নের স্বাস্থ্য কেন্দ্রই ভরসা। নিরীক্ষার তথ্যানুযায়ী রোগীদের ৩০.৮ শতাংশ বলেছেন, স্বাস্থ্য কর্মীদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট না, বাকী সবাই বলেছেন তারা স্বাস্থ্য কর্মীদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট।

চার্ট ২ফ: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দালালদের উপদ্রব

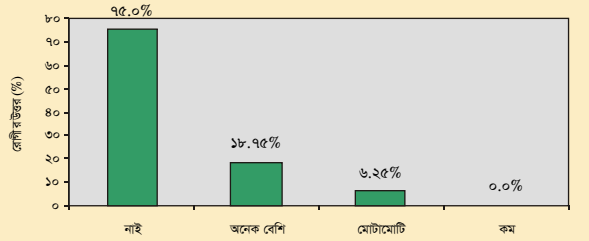

জেলা এবং উপজেলা হাসপাতালগুলোতে দালালদের উপদ্রব একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূল পর্যায়েল গরীব মানুষেরা যারা শুধূমাত্র উপজেলা পর্যায়ে সেবা প্রার্থী তারা বিভিন্নভাবে সেবাবঞ্চিত এবং প্রতারণার ফাঁদে পড়ে আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নিরীক্ষার তথ্যানুযায়ী ১৮.৭৫ শতাংশ রোগী দালালদের খপ্পরে পড়েছেন এবং ৬.২৫ শতাংশ রোগীদের কাছে দালালরা আসলেও প্রতারণার ফাঁদে ফেলতে পারে নি।

২.২ সুপারিশসমূহ:

জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ে রোগী, ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান, হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারি, রোগীর অভিভাবক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, স্থানীয় জনসাধারণ ও ভুক্তভোগীদের সাথে আলোচনা করে যেসকল সুপারিশগুলো পাওয়া তা হলো:

- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ১ জন গাইনি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেয়া বা গাইনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাব এ্যাসিসট্যান্ট কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (নারী) নিয়োগ দেয়া এবং আবাসনে অবস্থান বাধ্যতামূলক করা। সাধারণ জনগণের উপস্থিতিতে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে কমিউনিটি গ্রুপ নির্বাচন করা;
- কমিউনিটি গ্রুপ সক্রিয়করণের উদ্‌যোগ গ্রহণ করা এবং তাদের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ক্ষমতা দেওয়া ও কার্যকর নীতমালা থাকা;

- কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য কন্টিজেন্সি বাবদ বরাদ্দ রাখা;
- কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সহকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও উপকরণের ব্যবস্থা করা;
- ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এমবিবিএস ডাক্তারের নিয়োগ এবং অবস্থান নিশ্চিত করা; উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিকে কার্যকর করা, কমিটি বা ইউনিয়ন পরিষদের কাছে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করাসহ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর করা;
- জেলা ও উপজেলা হাসপাতালসমূহে নির্ধারিত বেড অনুযায়ী জনবল, ডাক্তার নিয়োগ, প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ, বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পরীক্ষা উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- হাসপাতালে ট্রলী, পর্যাপ্ত হুইল চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে
- উপজেলা হাসপাতালকে ১০০ বেডে উন্নীত করা;
- রোগীদের নিকট থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থ আদায় প্রতিরোধে সুপারভিশন/মনিটরিং ব্যাবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; রোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধ করতে হাসপাতালের সবধরনের লেনদেনে রশিদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং রশিদ ছাড়া অর্থ প্রদান না করার ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে;
- কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে অন্তত ১জন করে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ দেয়া;
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ মোতাবেক সিটিজেন চার্টার প্রদর্শণের ব্যবস্থা করা,সিটিজেন চার্টারে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের টেলিফোন/মোবাইল নম্বর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে করে তাৎক্ষণিকভাবে জনসাধারণ তাদের অভাব-অভিযোগ অবহিত করতে পারেন। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে;
- সেবা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া;
- স্থানীয় সরকার এবং হাসপাতাল পরিচালনা পর্ষদ এর নিকট জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর নীতিমালা করা;
- ডাক্তারদের সরকারি চাকুরি করে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার জন্য কার্যকর নীতিমালা তৈরি ও তা বাস্তবায়ন করা;
- হাসপাতাল প্রাঙ্গণে দালালদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে;
- হাসপাতালে সরবরাহকৃত খাবারের মান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা;
- নিয়মিত সিটিজেন চার্টার ও ওষুধের তালিকা আপডেট করা;
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে স্ব উদ্যোগে অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যাতে কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জনমত জানতে পারেন;
- সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবার মান নিশ্চিতকরণে বেসরকারি উদ্‌যোগে সামাজিক পরীবিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা;
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতালে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা;
- শয্যার ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ না দিয়ে এলাকার দারিদ্র্য ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ এবং ডাক্তার, ঔষধ ও এ সংক্রান্ত সেবা নির্ধারণ করা;
- ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীদের হোম ভিজিট বাড়ানো;
- মানসম্মত ও রোগীর ধরন অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা;
- চিকিৎসা কেন্দ্র বা হাসপাতলে রোগীবান্ধব ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করা;
- বিনা মূল্যে সকল ঔষধ প্রদান করা;
- স্বাস্থ্য বিভাগের সচিবসহ সকল উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকেই নিয়োগদান;
- গ্রামে অবস্থান ও চিকিৎসায় সুনামের ওপর ভিত্তি করে পদোন্নতি ও সুযোগ সুবিধা দান
- ওষুধ কোম্পানীর বিপণন কর্মীদের হাসপাতাল ক্যাম্পাসে চলাচল নিষিদ্ধ বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা দরকার।

পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন:
প্রাথমিক শিক্ষা চিত্র

৩.১ সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা চিত্র

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার শুধু পরিমাণগত অর্জন নয়; গুণগত অর্জনও নিশ্চিত করা দরকার। একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত পড়াশুনার পর তা যে পর্যায়েই হোক শিক্ষার্থীরা যাতে মাত্রানুযায়ী নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো দক্ষতা ও মনোবল অর্জন করতে পারবে–এটাই প্রত্যাশিত। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ এ ধরনের মানসম্মত শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। ২০১০ সালে ঘোষিত জাতীয় শিক্ষানীতিতেও ২০১০-১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। গত কয়েক দশকে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ভর্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন হলেও সমাপনীর হার এখনো উদ্বেগজনক এবং গুণগতমানের দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। প্রতি বছরই সরকার বাজেট ঘোষণার সময় শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকারের কথা বিবেচনায় নিয়ে এ খাতে সবচেয়ে বেশি বাজেট বরাদ্দ দেয়ার কথা উল্লেখ করেন। সরকারের দেয়া এই বাজেট প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে বিরাজমান নানাবিধ সমস্যা লাঘব করে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং সার্বিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব পড়েছে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান–সুপ্র ২০টি জেলায় সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করেছে। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান কী কী সমস্যা, সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সাক্ষাতকার এবং এফজিডির মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতি তুলে আনা হয়েছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজন ও সরকারি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সুপারিশ নেয়া হয়েছে।

৩.১.১ স্কুল পর্যায়ে বাজেট বরাদ্দের প্রক্রিয়া ও পরিমাণ

কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত বাজেট নিয়ে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ খুব একটা অবগত নন। তবে বরাদ্দকৃত ব্যয়ের অর্থ পেতে (সময়ক্ষেপন, কর্তৃপক্ষের সাথে ঘন ঘন যোগাযোগ করতে হয় এবং এজন্য কোনো ভাতা শিক্ষকরা পান না) দীর্ঘসুত্রিতা ঘটে বলে জানা যায়। তাছাড়া কন্টিজেন্সি খাতে স্কুলের খাতা, কলম ও দৈনন্দিন খরচ নির্বাহের জন্য শিক্ষক প্রতি মাসে ১০০ টাকা হিসাবে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। এই টাকা ত্রৈমাসিক চাহিদার ভিত্তিতে উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষকরা বলেন, যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হয তা অপর্যাপ্ত এবং এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়ে স্কুল শিক্ষকেরা মত ব্যক্ত করেন। এছাড়া বিদ্যালয়ের SLIP প্রকল্পের আওতায় বছরে ২০,০০০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জানা যায় এই টাকা পাওয়ার জন্য অনেকসময় ঘুষ দিতে হয়। মোট টাকা থেকে কর এবং ঘুষ বাদে ১৮,০০০-১৮,৫০০টাকা পাওয়া যায়। এই টাকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্লিপ কমিটির অনুমোদন নিয়ে সরাসরি সরকার থেকে নির্দেশিকা অনুসরণ করে বিদ্যালয় উন্নয়নের কাজ করতে পারে। স্লিপের টাকা ব্যয়ের জন্য শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যের সমন্বয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষকরা বলেন, স্লিপের অর্থ যে সময় পাওয়ার কথা তা তারা পান না। এরফলে দেখা যায় বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজগুলো করতে বিলম্ব হয়। এছাড়া বিদ্যালয়ে বাৎসরিক চাহিদাভিত্তিক ১-১.৫ লক্ষ টাকা অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য থোক বরাদ্দ দেয়া হয় যা এসএমসির মাধ্যমে খরচ করা হয়। প্রতিবছরেই এই টাকা বরাদ্দ থাকে না। থোক বরাদ্দের জন্য রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায়। রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজেদের এলাকায় বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য নিজেদের পছন্দমতো স্কুলে বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে স্কুলের চাহিদা তেমন একটা গুরুত্ব পায় না। এ প্রসঙ্গে ময়মনসিংহের বুরোর চরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক বলেন, থোকের টাকা বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্কুলের সত্যিকারের চাহিদার চেয়ে রাজনৈতিক প্রভাবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কন্টিনজেন্সি, স্লিপ ও থোক বরাদ্দের টাকা উপজেলা একাউন্টস্ অফিস থেকে ছাড় হয়।

৩.১.২ ভর্তি ও সমাপনী

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের টার্গেট অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার নেট ভর্তির হার ১০০%-এ উন্নীত করা এবং ঝরে পড়ার হার শূন্যে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারেও ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। দ্রুততম সময়ে এ লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য ২০১০-১১ সালের বাজেট বক্তৃতায় দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম, উপবৃত্তি, বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১ হাজার ৫০০ নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, নতুন ৪০ হাজার শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ এবং চর, হাওর, চা-বাগান ও দুর্গম এলাকায় শিশুবান্ধব শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের উদ্‌যোগের কথা বলা হয়েছে। সুপ্র পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষায় সাক্ষাতকারে অংশগ্রহণকারী ৫৬.৫৮% উত্তরদাতা মনে করেন, বিদ্যালয়ে আসার উপযোগী সকল শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং ৪৩.৪৩% উত্তরদাতাই মনে বিদ্যালয়ে আসার উপযোগী সকল শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। ১০০% উত্তরদাতা মনে করেন ক্যাচমেন্ট এরিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু উক্ত এলাকার নাগরিক প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রদান করেন। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের ৫৯.৬৭% মনে করেন বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী সকল শিশু বিদ্যালয়ে যায় এবং ৪০.৩৪% এর মতে সকল শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। বিদ্যালয়ে না যাওয়ার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য, অভিভাবকদের অসচেতনতা, দারিদ্র্য ও অসচেতনতা উভয়ই, দূরবর্তী স্কুল, স্কুলে যেতে শিক্ষার্থীদের অনীহা এবং কিছু সংখ্যক উত্তরদাতা বাল্যবিবাহকেও দায়ী করেন। যদিও এই সংখ্যা খুবই কম। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৪%-র মতে দারিদ্র্য, ৪%-এর মতে অসচেতনতা, ৩৬%-এর মতে দারিদ্র্য ও অসচেতনতা, ৪%-এর মতে দূরবর্তী স্কুল এবং ১% বাল্যবিবাহ এবং শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় গমনে অনীহাকে বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

টেবিল: ৩.১

শিক্ষার্থী ভর্তি সম্পর্কে শিক্ষকদের অভিমত		
স্কুলে আসার উপযোগী সকল শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় কিনা	হ্যাঁ ৫৬.৫৮%	না ৪৩.৪৩%
ক্যাচমেন্ট এলাকার বাইরে থেকে শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় কিনা	১০০%	০%

টেবিল: ৩.২

শিক্ষার্থী ভর্তি সম্পর্কে নাগরিক সমাজের অভিমত		
আপনার এলাকার সকল শিশু বিদ্যালয়ে যায় কিনা	হ্যাঁ ৫৯.৬৭%	না ৪০.৩৪%

চার্ট ৩ক: বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ

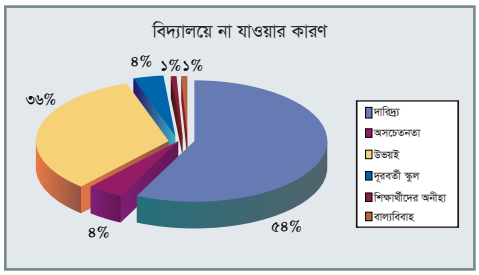

শিক্ষক, অভিভাবক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সকলের মতে, বিদ্যালয়ে ভর্তির হার আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষকের মতে, ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সকল শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির কথা বলা হলেও অভিভাবক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বলেন, ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সকল শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। আবার অনেক সময় যোগাযোগ ও দুরত্বের কারণে এক স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ছাত্র-ছাত্রী অন্য স্কুলে ভর্তি হয়। আবার কিছু কিছু স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়া এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যার ফলে দেখা যায়

চার্ট ৩খ: বিদ্যালয়ে ভর্তি ও সমাপনী

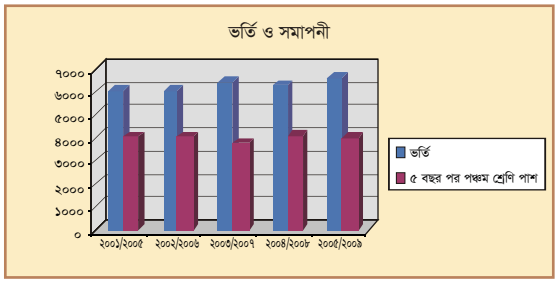

এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের স্কুলের দুরত্ব অনেক বেশি। নেত্রকোণা জেলার সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণের দায়িত্ব শিক্ষকদের হলেও অনেক শিক্ষকরা ক্যাচমেন্টের মানচিত্র তৈরি প্রক্রিয়া সম্পর্কে দক্ষ নয়। চর, হাওর ও পার্বত্য অঞ্চলে ক্যাচমেন্ট এরিয়ার কাছাকাছি স্কুল না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার একই ক্যাচমেন্ট এরিয়ার মধ্যে একাধিক বিদ্যালয় (সরকারি, রেজিস্টার্ড, এবতেদায়ী. এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়) থাকায় দেখা যায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হ্রাস পাচ্ছে। এ সমস্যাগুলো উত্তোরণের জন্য বছরের শুরুতে প্রাথমিক শিক্ষায় পরিচালিত শিশু জরিপটি যথাযথভাবে এবং গুরুত্ব সহকারে করা প্রয়োজন। স্কুল উপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০০৯ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০০৯ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেট ভর্তির হার ৯৩.৯%। অগ্রগতি প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এই ভর্তিও হার ২০০৫ সালের চেয়ে ১.৯% বেশি। (সূত্র: প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক মূল্যায়ণ প্রতিবেদন ২০১০) একই প্রতিবেদনে ঝরে পড়ার হার বলা হয়েছে ৪৫.১%। সুপ্র পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষা ভর্তি ও পাশের হার বোঝার জন্য বিদ্যালয়ে ২০০১ সালে প্রথম শ্রেণিতে যে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছিল এবং ৫ বছর পর অর্থাৎ ২০০৫ সালে কতজন শিক্ষার্থী পড়াশুনা শেষ করতে পেরেছে অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্যগুলো তুলে আনে। সুপ্র পরিচালিত নিরীক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষাবছরের ৫ বছরের (২০০১-২০০৫) ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ৫ বছর পর (২০০৫-২০০৯) অর্থাৎ ২০০১ সালে যারা ভর্তি হয়েছে ২০০৫ সালে কতজন সমাপনী করতে পেরেছে-এ বিষয়ে বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ২০০১-২০০৫ পর্যন্ত ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার গড়ে ৬৩.৩৮%। ২০০৯ সালে এসেও ঝরে পড়ার এই হার (৩৬.৬২%) আশংকাজনক। এ পরিস্থিতিতে সহস্রাব্দ লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা সরকারের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

৩.১.৩ বিনা মূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ

চার্ট ৩গ: শিক্ষার্থী অনুসারে বই বিতরণ

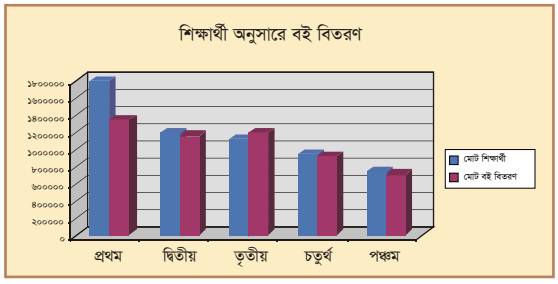

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদের সবার জন্য একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা এবং সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের বাধ্যবাধকতা অনুসরণে ১৯৯০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি (১লা ফাল্গুন, ১৩৯৬) ২৭নং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং ১৯৯৩ সালেই সারাদেশে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি' চালু করা হয়। তাই অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্য-পুস্তক প্রদান করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে বই পৌছানো একটি বড় ধরনের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্র হতে বিদ্যালয় পর্যন্ত বই বিতরনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এই স্তরসমূহ যথাক্রমে: কেন্দ্র, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও বিদ্যালয়।

চার্ট ৩ঘ: পাঠ্যবই চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল কিনা

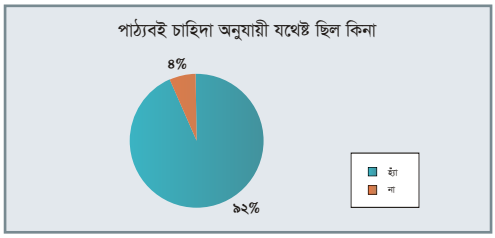

শিক্ষার্থীদের কাছে সময়মতো বই পৌঁছে দেয়ার বিষয়টিও মানসম্মত শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। বই বিতরণের বিভিন্ন স্তর থাকলেও গবেষণায় উপজেলা থেকে বিদ্যালয়ে বই বিতরণ প্রক্রিয়া ও বিতরণ প্রক্রিয়ার সমস্যা এবং বিদ্যালয়ের পাঠানো চাহিদাপত্র বই পাওয়া গেছে কিনা তা দেখা এবং বিদ্যমান সমস্যাসমূহ উত্তরণের উপায় নিরীক্ষার মাধ্যমে তুলে আনা হয়েছে। ২০ জেলার ৮০টি সরকারি স্কুলের ওপর পরিচালিত নিরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জানা যায়, জেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা বিনা মূল্যে পাঠ্যবই পেয়েছে। এছাড়া সরকারি, রেজিস্টার্ড, এনজিও, মিশন ও কেজি স্কুলের মোট ৫৩৫৮৯৮৮ জন শিক্ষার্থী বিনামূল্যে বই পেয়েছে। বই পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কোনও প্রকার টাকা দিতে হয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষকে। জেলা অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বইগুলো ডিসেম্বর'০৯ এর প্রথম সপ্তাহে উপজেলা শিক্ষা অফিসে বিতরণের জন্য প্রেরণ করা হয়। উপজেলা শিক্ষা অফিস সেগুলো জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই স্কুলগুলোতে বিতরণ করে। কিন্তু স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে এফজিডির মাধ্যমে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, তারা বইগুলো জানুয়ারি থেকে পাওয়া শুরু করছে এবং কেউ কেউ মে'১০ও বই পেয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এ তথ্যের ভিত্তিতে নোয়াখালীর একজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বইগুলো তারা জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে পেয়েছেন। কিন্তু তাদেরকে বই প্রাপ্তি শীটে স্বাক্ষর করতে হয়েছে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের তারিখেই। তবে অনেক স্কুলে জানুয়ারির মধ্যেই সকল বই পেয়েছে। নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৯২% শিক্ষকরা মনে করেন, সরকার থেকে পাঠানো বই স্কুলের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল এবং ৮% শিক্ষক মনে করেন যথেষ্ট ছিল না। সকল শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী সরকার থেকে নতুন বই সরবরাহ না করায় পুরাতন বই দিতে হয়েছে।

চার্ট ৩ঙ: বই পরিবহন বাবদ ব্যয়

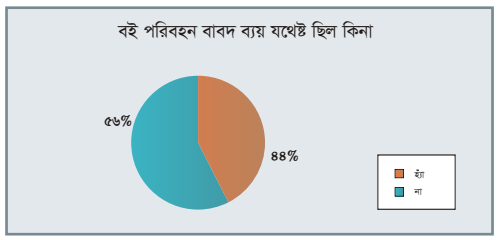

উপজেলা থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্যবই পরিবহনের জন্য সরকার থেকে প্রতিবছর স্কুল ভেদে ২০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, পাঠ্য বই আনার জন্য শিক্ষকদের কখনও কখনও দু'বার উপজেলায় যেতে হয়েছে। একদিকে দুর-দুরান্তের বিদ্যালয়ের জন্য এ বাজেট যেমন অপ্রতুল, তেমনি একাধিক বার উপজেলায় যাতায়াতের জন্য শিক্ষকদের বাড়তি খরচ হয়েছে প্রায় এক থেকে দেড় হাজার টাকা। নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মাত্র ৪৪% শিক্ষক মনে করেন বই আনা বাবদ পরিবহন খরচ যথেষ্ট ছিল এবং ৫৬% শিক্ষকই মনে করেন এটি অপ্রতুল। শিক্ষকরা জানান, বইগুলো বার বার কিছু কিছু করে না দিয়ে একসাথে দিলে তাদের অর্থ ও সময় দু'ই অপচয় কম হবে। বই পরিবহনের জন্য বাড়তি খরচ শিক্ষকদের না দেয়ায় এগুলো নিজেদেরকেই বহন করতে হয়। এছাড়া একসাথে বই পেলে জানুয়ারি মাসেই ক্লাস শুরু করা যেতে পারে এবং সকল শিক্ষার্থী ক্লাসে আগ্রহী হয়। বই না থাকলে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে আগ্রহী হয় না। এছাড়া নতুন বইয়ের সংকটের কারণে পুরাতন দেয়ার শিক্ষার্থীদের পড়ার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ কাজ করে। কারণ পুরাতন বইয়ে দাগ দেয়া ও নাম লেখা থাকে এবং এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী কোনও শিক্ষার্থীই পুরাতন বই পড়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করে নি।

৩.১.৪ শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকদের অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব

শিক্ষানীতি অনুযায়ী মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ থাকা প্রয়োজন। ২০০৯-১০ সালের বাজেট বক্তৃতায় সরকার শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত কমিয়ে আনার জন্য ৪৫ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা

দিয়েছিল।(সূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০১০-১১) এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১০ সালের জুন মাসের মধ্যে ২০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যদিও এই সংখ্যা শিক্ষকদের শূন্য পদ পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

টেবিল: ৩.৩

জেলায় শূন্য পদে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার সংখ্যা					
মোট শিক্ষকের পদ	কর্মরত মোট শিক্ষক	শিক্ষকের শূন্য পদ	মোট শিক্ষা কর্মকর্তা	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
১,১২,২৮৫	১,০৪,৫৮০	৭,৭০৫	১,১৭৮	৯৩৪	২৪৪

মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, স্কুলের শিক্ষকের পদ সংখ্যা কম থাকা, পদ অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ না দেয়ার ফলে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৮ সালের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১:৩০-এ নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, ২০টি জেলায় শিক্ষকের পদ রয়েছে ১,১২,২৮৫ জন। এর মধ্যে কর্মরত আছে ১,০৪,৫৮০ জন এবং শূন্য পদ রয়েছে ৭,৭০৫ জন। শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বর্তমান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াটি ভাল হলেও এর মধ্যে কিছু অসংগতি রয়েছে। প্রথমত: নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ফলে কোথাও শিক্ষক স্বল্পতা থাকলেও স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারে না। এছাড়া একটি উপজেলায় বর্তমানে যতটি শূন্য পদ রয়েছে শুধু সেই পদ পূরণের জন্যই বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে আরও কিছু শূন্য পদ তৈরি হয়ে যায়। যার ফলে শিক্ষক স্বল্পতা নিত্যনৈমত্তিক একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যা মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। এছাড়া শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য তদারকি। কিন্তু শিক্ষা কর্মকতাদের অপর্যাপ্ত পদ সংখ্যা এবং যা আছে সেগুলোর মধ্যে পদগুলো শূন্য থাকার জন্য তদারকি প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

মানসম্মত শিক্ষা কেবল একটি নিয়ামকের ওপর নির্ভরশীল নয়। মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য দরকার প্রশিক্ষিত শিক্ষক। ৮০টি স্কুলে পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষার পরিচালিত জরিপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের সকলেই পিটিআই থেকে সিনএড প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। শিক্ষকরা জানান, সিইনএড প্রশিক্ষণ সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন শ্রেণিকক্ষের আয়তন, ক্লাসের পর্যাপ্ত সময়, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে দেখা যায়, প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে একজন শিক্ষককে ক্লাসে পাঠদানে যে সময় দিতে হয় তা তারা দিতে পারেন না। শিক্ষকদের ক্লাসের জন্য যে সময় বরাদ্দ থাকে অনেক সময় হাজিরা ডাকতেই অর্ধেক সময় চলে যায়। এর ফলে সবার প্রতি মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা প্রদান সম্ভব হয় না। সরকারি ক্যারিকুলাম অনুযায়ী যেভাবে ক্লাসে শিক্ষা প্রদান করার কথা তাতে একটি ক্লাস নিলে একজন শিক্ষককে একটি ক্লাস বিরতি নিতে হয়। কিন্তু শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষকদের বিরতিহীন ক্লাস নিতে হয়। শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককের সাপ্তাহিক কার্য ঘণ্টা ৩৬ ঘণ্টা। এরমধ্যে পাঠদান ১৮ ঘণ্টা, শিক্ষার্থী পরিচালনা ও সংশোধন ৬ ঘণ্টা, অনুশীলনী তৈরি ৮ ঘণ্টা এবং অন্যান্য কাজ ৪ ঘণ্টা। সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী ২৯% শিক্ষককে সপ্তাহে ১০-২০টি, ৩৫% শিক্ষক সপ্তাহে ২১-৩০টি ক্লাস, ১৬% শিক্ষককে সপ্তাহে ৩১-৪০টি ক্লাস, ৯% শিক্ষককে ৪১-৫০টি এবং ১১% শিক্ষককে সপ্তাহে ৫১-৬০টি ক্লাস নিতে হয়। প্রধান শিক্ষকদের নানা দাপ্তরিক কাজের জন্য তুলনামূলকভাবে ক্লাস নেয়ার পরিমাণ সহকারী শিক্ষকদের চেয়ে কম। সহকারী শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার পরিমাণ আরও বেশি। এরফলে দেখা যায় শিক্ষকদের ৩৬ ঘণ্টার যে কার্যসূচি

চার্ট ৩চ: সপ্তাহে শিক্ষক প্রতি ক্লাস নেয়ার সংখ্যা

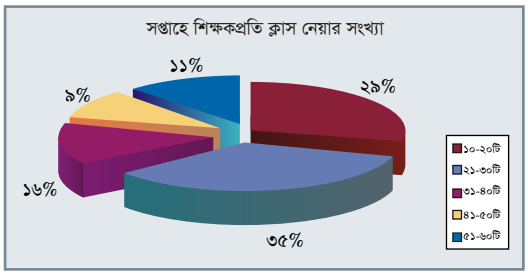

চার্ট ৩ছ: বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক

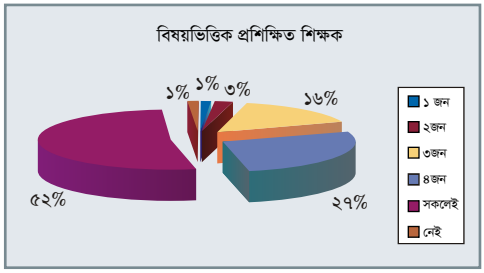

সেটি পালন করতে পারছেন না। বিরতিহীন ক্লাসের ফলে শিক্ষকরা শারীরিক ও মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে যা মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। সাক্ষাতকারে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের সকলেই পিটিআই থেকে সিইনএড প্রশিক্ষণ পেলেও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সকলেই পায় নি। প্রধান শিক্ষকের দেয়া তথ্যানুযায়ী, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভাবে বিদ্যালয়ে ইংরেজি, গণিত বিষয়ে শিক্ষাদান করার মতো মানসম্মত শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে।

নিরীক্ষার তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, ৫২% স্কুলে সকল শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ২৭% স্কুলে ৪জন করে, ১৬% স্কুলে ৩ জন করে, ৩% স্কুলে ২ জন করে এবং ১% স্কুলে ১ জন করে শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। নিরীক্ষাধীন স্কুলগুলোর মধ্যে কোনও শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পায় নি এমন স্কুলের সংখ্যা ১%। তবে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেলেও কোনো শিক্ষকই দেশে বা বিদেশে উন্নত কোনো প্রশিক্ষণ পান নি বলে জানান। বিদ্যালয়ে নতুন যেসব শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের সকলের সিইনএড প্রশিক্ষণ নেই। এ প্রসঙ্গে বগুড়ার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বলেন, শিক্ষকদের দ্রুত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সম্পাদন করা উচিত। প্রায় প্রত্যেকটি স্কুলে প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য প্রান্তিক শিশুদের একীভূত শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক আছেন। তবে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদানের ওপর দেশে-বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোনও শিক্ষকের নেই। তাছাড়া প্রত্যেকটি স্কুলের সকল শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষা বা বিশেষ শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন।

টেবিল: ৩.৪

অতিরিক্ত কাজ পাঠদানে ব্যাহত করে কি না?	
হ্যাঁ	না
১০০	০

এছাড়া শিক্ষকদের পাঠদানের বাইরে অর্পিত অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব, প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজের দায়িত্ব, প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন কারণে ছুটির কারণে নিয়মিতভাবে সকল শিক্ষক একসাথে স্কুলে উপস্থিত থাকে না এবং নিয়মিত ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না।

পাঠদান ছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অতিরিক্ত যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তা হলো:ভোটার তালিকা তৈরি, আদমশুমারি, উপবৃত্তি প্রদান, ভোটকেন্দ্রের দায়িত্ব, পোলিও টিকা খাওয়ানো ইত্যাদি। পাঠদানের বাইরে বিভিন্ন জরিপ কাজে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষকদের পাঠদানে মনোসংযোগ ব্যাহত হয় বলে সকল শিক্ষক মন্তব্য করেন।

৩.১.৫ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান

সরকার ২০১৫ সালকে সামনে রেখে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ এর আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-২) এ শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ এ প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি কর্মকৌশলের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ কৌশলসমূহ যথাক্রমে শিক্ষক নিয়োগ ও তার প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকদের পেশাদারিত্ব মান নিশ্চিতকরণ, স্কুলের সঙ্গে কমিউনিটির ও স্থানীয় সরকারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলা। মানসম্মত শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং বছর বছর এর জন্য বাজেট ব্যয় হলেও আশানুরূপভাবে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পায় নি বলে মনে করেন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। স্কুলে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি পূর্বের চেয়ে বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষার গুণগত মান। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের সাথে এফজিডির মাধ্যমে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, শিক্ষার্থীরা ক্লাসের পড়া ঠিকমতো বুঝতে পারে না। ফলে তাদের নোট বই

কিনে দিতে হয় এবং বাড়িতে গৃহ শিক্ষক দিতে হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার প্রচুর চাপ অনুভব করে ও ক্লাসের পড়া ক্লাসে শেষ করতে পারে না। আনন্দহীন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক চর্চার অভাব, শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত, খেলাধুলার সামগ্রী না থাকা সর্বোপরি ক্যারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণ না থাকা এগুলো প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের ক্ষেত্রে বড় বাধা বলে তারা মনে করেন। স্কুলে আনন্দপূর্ণ শিক্ষাদান, নিয়মিত সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার আয়োজন করা শিক্ষার গুণগত মানের সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাতকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় ১০০% স্কুলেই ক্রিড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। সাক্ষাতকারে অংশগ্রহণকারী ৯৬.২৫% শিক্ষক জানান বিদ্যালয়ে নিয়মিত চারু ও কারুকলা ক্লাস হয় এবং মাত্র ৩.৭৫% উত্তরদাতা নিয়মিত ক্লাস হয় না বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের এফজিডির মাধ্যমে কথা বলে জানা যায়, বিদ্যালয়ে প্রতি বছর ক্রিড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলেও নিয়মিত চারু ও কারুকলা ক্লাস হয় না। বিদ্যালয়ে চারু ও কারুকলা বিষয়ে প্রশিক্ষিত কোনো শিক্ষক না থাকার জন্য নিয়মিতভাবে ক্লাস করা সম্ভব হয় না। চারু ও কারুকলা ক্লাস বিষয়ে চুয়াডাঙ্গার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক বলেন, "নাচ গান শিখিয়ে, মাজা দুলানো শিখিয়ে শিক্ষার্থীদের নীতি-নৈতিকতা নষ্ট হচ্ছে, ধীরে ধীরে চরিত্র নষ্ট হচ্ছে, ভবিষ্যতে ঐ শিক্ষার্থীর দ্বারা সমাজের ভাল কিছু আশা করা যায় কীভাবে?" শিক্ষকের এই ধরনের অভিমত প্রকাশের মধ্য দিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও মৌলবাদী চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে যা শিক্ষার্থীদের যুক্তিবাদী, সাংস্কৃতিক মানসিকতাসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করবে।

নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও অভিভাবকগণ অভিমত প্রকাশ করেন, মানসম্মত শিক্ষার আরেকটি বড় বাঁধা হলো মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ না দেয়া। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই দলীয় বিবেচনায় এবং অর্থের বিনিময়ে অনুপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হচ্ছে। যাতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান। সাক্ষাতকারে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিয়োগ প্রক্রিয়ার কোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করা সমীচীন নয় বলে মনে করেন। তবে সাক্ষাতকারে অংশগ্রহণকারীগণের অনেকের মতে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিয়োগ বিগত কয়েক বছরের তুলনায় স্বচ্ছ হয়েছে। শিক্ষার গুণমতমান শুধুমাত্র একটি নিয়ামকের ওপর নির্ভরশীল নয়। গুণমত মানের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও তার প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের পেশাদারিত্ব মান নিশ্চিতকরণ, স্কুলের সঙ্গে কমিউনিটির ও স্থানীয় সরকারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক উন্নয়ন, সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

৩.১.৬ স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির ভূমিকা

বিদ্যালয় পরিচালনা এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির (এসএমসি) ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্কুলের প্রায় সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে ম্যানেজিং কমিটি জড়িত থাকেন। বিশেষ করে ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে। তাছাড়া উপবৃত্তি, ক্রিড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক মিলাদ, ভর্তি, ফলাফল, দান-অনুদান প্রাপ্তি, মেরামত ও নির্মাণ, কোচিং ইত্যাদি বিষয়গুলোতে ম্যানেজিং কমিটি ভূমিকা এবং প্রভাব দুটোই থাকে। নিয়ম অনুযায়ী দাতা, বিদ্যুৎসাহী, অভিভাবক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইউপি সদস্য, শিক্ষক প্রতিনিধি ও নারী অভিভাবকের সমন্বয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট সদস্যের সমন্বয়ে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি) গঠন করা হয়। প্রতি মাসে একবার করে বছরে ১২টি সভা হওয়ার কথা রয়েছে প্রতিটি মিটিং-এর কার্যবিবরণী লেখার বিধান রয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯২.১১% বলেন, নিয়মিত সভা হয় এবং ৭.৮৯% বলেন নিয়মিত সভা হয় না। উত্তরদাতাদের বেশিরভাগ নিয়মিত সভা হওয়ার কথা বললেও দেখা যায় গত

চার্ট ৩জ: ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা

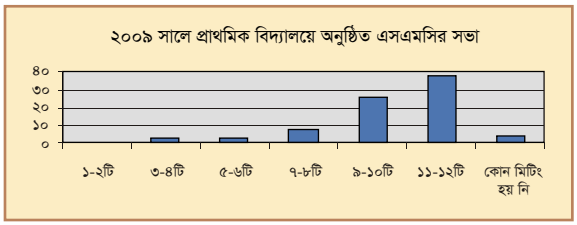

২০০৯ সালে ম্যানেজমেন্ট কমিটির মাসিক কোনো সভা হয় নি এমন উত্তরদাতার হার ৫%। ১১-১২টি সভা হয়েছে এমন উত্তরদাতা মাত্র ৪৭.৫%। ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতিগণ নিয়মিত সভা হওয়ার কথা বললেও বাস্তবে সদস্যদের কাছে কথা বলে জানা যায়, সভাগুলো নিয়মিত হয় না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চূয়াডাঙ্গার একজন এসএমসির সভাপতি বলেন, মাসিক মিটিংয়ের কথা থাকলেও অনেক সময় নিয়মিত মিটিং হয়না। তবে নিয়মিত না হলেও ১২ মাসে ১২টি মিটিং খাতা-কলমে থাকে। বাসায় এসে কার্যবিবরণী খাতায় স্বাক্ষর নিয়ে যান। আবার অনেক সদস্য কিছু মিটিং এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে মন্তব্য করেন। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়মিত স্কুল তদারকি করা, প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ যেমন: ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলমূখী করা, অনুপুস্থিত শিক্ষার্থীদের খোঁজ-খবর নেয়া, হোম ভিজিট, অভিভাকদের সাথে যোগাযোগ, বাড়তি কোচিং এর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের পরামর্শ, দায়িত্বশীল ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।

চার্ট ৩ঝ: ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা

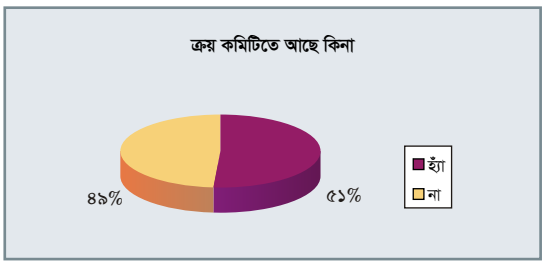

ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবে ক্রয় কমিটিতে থাকা বাধ্যতামূলক হলেও মাত্র ৫০.৬৫% ক্রয় কমিটিতে আছেন এবং ৪৯.৩৫%ক্রয় কমিটিতে নেই। (সূত্র: সামাজিক নিরীক্ষা ২০১০) এই চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট কমিটির সক্রিয় ভূমিকার অভাব রয়েছে। জেলা থেকে প্রাপ্ত সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেশিরভাগ ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। প্রায়ই স্কুলে আসে, খোঁজ খবর নেয় তবে ক্রয় কমিটি বা অন্যান্য কাজে বেশী আগ্রহী না। মাসিক মিটিং নিয়মিত হয়, তবে সকল সদস্য উপস্থিত থাকে না এবং সদস্যরা অত্যাধিক ব্যস্ততার কারণে মাসিক সভায় ফলপ্রসূ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্বাচিত হওয়ার ফলে অনেক বিষয়েই তারা অযাচিত হস্তক্ষেপ করে। নিরীক্ষাভুক্ত এলাকার কিছু ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি স্কুল উন্নয়নের যাবতীয় কাজ একক সিদ্ধান্তে করে থাকেন। এক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির তদারকি অনেকসময় শিক্ষকবৃন্দও সহজভাবে গ্রহণ করেন না বলে মন্তব্য করেন একজন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির তদারকির ওপর গুরুত্বারোপ করেন বেশিরভাগ (৬০%) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার।

চার্ট ৩ঞ: অবকাঠামো

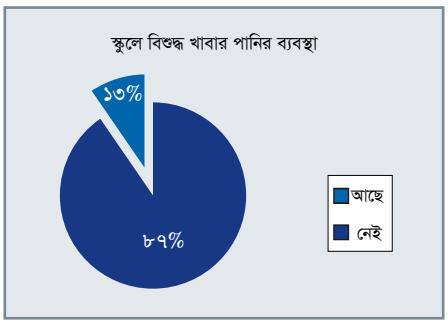

৩.১.৭ অবকাঠামো

গুণগত শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো থাকা দরকার। নিরীক্ষার তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, ৮৭% বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য টিউবওয়েলের ব্যবস্থা আছে। ১৩% বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য টিউবওয়েল নেই। টিউবওয়েল না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা যাদের বাড়ি দূরে তারা অনেকেই বিদ্যালয় চলাকালে পানি পান না করেই থাকার চেষ্টা করে অথবা পাশের কোনো বাড়িতে গিয়ে পানি পান করে। ।

চার্ট ৩ঞ অনুযায়ী, ৪৭% বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের

ব্যবস্থা রয়েছে। ৩২% বিদ্যালয়ের শৌচাগারের অবস্থা মোটামোটি স্বাস্থ্যসম্মত, ১৬% বিদ্যালয়ে শৌচাগারের অবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এরমধ্যে ৫% বিদ্যালয়ে শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। গ্রামাঞ্চলের শৌচাগারগুলোতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকার জন্য এগুলো ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়।

চার্ট ৩ট: বিদ্যালয়ে শৌচাগারের অবস্থা

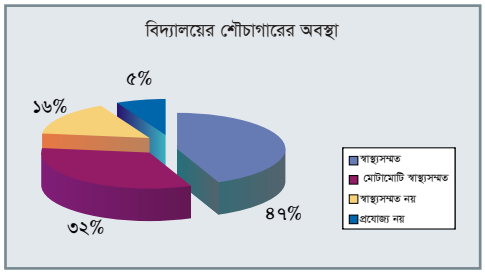

নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১৭.১১% বিদ্যালয়ের শৌচাগার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী বলে মনে করেন শিক্ষকবৃন্দ এবং ৮২.৯০% বিদ্যালয়ের শৌচাগার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী নয়। এছাড়া গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে মূল ভবন থেকে শৌচাগারগুলোর অবস্থান কিছুটা দূরে থাকার কারণেও সেগুলো শারিরীক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্যবহার কষ্টসাধ্য হয়।

চার্ট ৩ঠ: শৌচাগার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী কিনা?

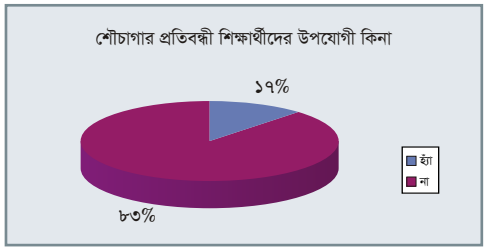

শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে এবং ৬৪.৯৪% বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। শৌচাগার স্থাপনের ক্ষেত্রেও আশে-পাশের পরিবেশ নারী শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের ব্যবহার উপযোগী কি-না এ বিষয়েও খেয়াল রাখা দরকার। উদাহরণস্বরূপ: নোয়াখালীর গোপীনাথপুর স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট নির্মাণ করা হলেও শুরু থেকেই এর একটি এলাকার এবং বাজারের লোকজন ব্যবহার করে আসছে। এ টয়লেটটি নির্মাণ করা হয়েছে স্কুল থেকে একটু দূরে রাস্তার পাশে যেখানে জনগণের প্রতিনিয়ত যাতায়াতের কারণে লোক সমাগম থাকে। বাজার এলাকার জনসাধারণের সামনে উন্মুক্ত টয়লেট ব্যবহার করতে শিক্ষার্থীরা বিব্রতবোধ করে– বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থীরা।

টেবিল: ৩.৫

নারী ও পুরুষ শিক্ষকদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে কিনা	
হ্যাঁ	না
৩৫.০৭%	৬৪.৯৪%

প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যেমন: চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, বেঞ্চ থাকা দরকার এবং একইসাথে শিশুদের বিনোদনের ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলার মাঠ এবং ফুলের বাগান থাকা দরকার। নিরীক্ষার তথ্যানুযায়ী দেখা যায় মাত্র ৭৭.৩৪% বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ আছে এবং ২২.৬৭% বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নেই। বাস্তবে দেখা যায়, খেলার মাঠ থাকলেও অনেক মাঠই খেলার জন্য উপযোগী নয়। কুমিল্লার বাগিচাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবছর ক্রিড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হলেও

টেবিল: ৩.৬

ভৌত অবকাঠামো		
	আছে	নেই
খেলার মাঠ আছে কিনা	৭৭.৩৪%	২২.৬৭%
ফুলের বাগান আছে কিনা	৩৩.৩৪%	৬৬.৬৭%
বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কিনা	৫৪.৬৭%	৪৫.৩৪%
প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোড এবং বেঞ্চ আছে কিনা	৯১.০৩%	৮.৯৮%

স্কুলের নিজস্ব খেলার মাঠ না থাকায় এ অনুষ্ঠানটি অন্যত্র করতে হয় বলে শিক্ষকরা জানান। মাত্র ৩৩.৩৪% বিদ্যালয়ের আঙিনায় ফুলের বাগান রয়েছে। নিরীক্ষার আওতাভুক্ত ৫৪.৬৭% বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। (সূত্র: সামাজিক নিরীক্ষা ২০১০) তবে সবগুলো শ্রেণিকক্ষে এই বিদ্যুতের সুবিধা নেই। ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিল উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে পাওয়ার কথা থাকলেও উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে টাকা পাওয়া যায় না বলে শিক্ষক মন্তব্য করেন।

৩.১.৮ উপবৃত্তি

নিরীক্ষাভুক্ত এলাকায় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, অভিভাবক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, উপবৃত্তি কার্যক্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি বাড়ালেও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারে নি। উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তের ফলে দরিদ্র শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই শর্তগুলো পূরণ করতে পারে না। উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য ৪০% নম্বর পাওয়া আবশ্যক। কিন্তু দেখা যায়, ক্লাসের যে শিক্ষাদান পদ্ধতি তাতে শিক্ষার্থীরা পড়াগুলো ঠিকমতো বুঝতে পারে না। ক্লাসের পড়ার জন্য তাদের বাবা-মা বা প্রাইভেট শিক্ষকের শরণাপন্ন হতে হয়। কিন্তু বেশিরভাগ দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের বাবা-মা নিরক্ষর থাকায় তারা সন্তানদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে কোনোরকম সাহায্য করতে পারে না। অন্যদিকে প্রাইভেট শিক্ষককে বেতন দেয়ার মতো আর্থিক সংগতি না থাকার ফলে তারা ক্লাসের পড়া ঠিকমতো বুঝতে পারে না এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। এরফলে তারা উপবৃত্তির শর্ত পূরণ করতে পারে না এবং উপবৃত্তি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষকরা মনে করেন, গরীব শিক্ষার্থীদের স্কুলমূখী করার জন্য টাকা দিলে এটি সহজ শর্তে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শর্ত ছাড়াই উপবৃত্তি দেওয়া উচিৎ।

উপবৃত্তির আরেকটি শর্ত হলো ৭৫% স্কুলে উপস্থিতি। কিন্তু দেখা যায় দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের পারিবারিক নানা ছোট-খাট কাজ করতে হয়, টুকটাক উপার্জনও করতে হয়। যার ফলে উপস্থিতির শর্ত পূরণে সে ব্যর্থ হয়। প্রতিটি স্কুলে যেহেতু ৫০% শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেক্ষেত্রে স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরাই শেষ পর্যন্ত উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।

শিক্ষকসংখ্যা কম থাকায় উপবৃত্তি প্রদান করতে গিয়ে শিক্ষকদের শিক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটে। এছাড়া শর্তের কারণে কোনো শিক্ষার্থী উপবৃত্তির টাকা কম পেলে বা না পেলে অভিভাবকরা অশালীন ব্যবহার ও মন্তব্য করেন। অনেকসময় রাজনৈতিক ও প্রভাবশালীদের চাপে শর্ত ভঙ্গ করে স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করতে হয়। এক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষকরা শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনা এবং টাকার পরিমাণ বাড়ানোর কথা বলেন। উপবৃত্তির টাকা শিক্ষকদের বিতরণ না করে সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরণ করার কথা বলেন।

৩.১.৯ মিড-ডে মিল

নিরীক্ষার আওতাভুক্ত কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে স্কুল মিল প্রকল্পটি চালু নেই। কিন্তু তারপরও অনেক শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, অভিভাবক এর প্রয়োজন অবশ্যই আছে বলে মনে করেন। শিক্ষকরা অভিমত প্রকাশ করেন, দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা যারা ঠিকমতো খেয়ে আসতে পারে না তাদের জন্য এটি খুব কার্যকর একটি উদ্‌যোগ হবে। এতে শিক্ষার্থীরা পুরো সময় স্কুলে স্বতঃফুর্ত ভাবে থাকতে পারবে এবং এতে ঝরে পড়া অনেক কমে যাবে বলে মত প্রকাশ করেন। স্কুলে দীর্ঘ সময় থাকার জন্য শিক্ষার্থীরা স্কুলের আশে-পাশের অস্বাস্থ্যকর খাবার খায় এবং রোগাক্রান্ত হয়। মিড-ডে মিল চালু হলে শিক্ষার্থীরা এই অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। শিক্ষক এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, মিড-ডে মিল সকল দরিদ্র প্রবণ এলাকায় চালু করা দরকার। তবে মিড-ডে মিল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করা উচিত হবে না বলে মনে করেন তারা।

৩.১.১০ জনবল

নিরীক্ষার আওতাভুক্ত কোনো বিদ্যালয়েই ৪র্থ শ্রেণির কর্মী এমনকি কোনো পরিচ্ছন্নতা কর্মী নেই। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা নিজ খরচে একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মী রেখেছেন। অনেক শিক্ষক মনে করেন সারা দেশে প্রায় ৩৭ হাজার নৈশপ্রহরীর পদ সৃষ্টি হচ্ছে এটি আনন্দের সংবাদ। কিন্তু তার থেকেও বেশী প্রয়োজন ছিল একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মী বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মী বা পরিচ্ছন্নতা কর্মীর অভাবে স্কুলগুলো অস্বাস্থ্যকর হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। বিশেষ করে শৌচাগার, শ্রেণী কক্ষ, মাঠ, খাবার পানি ইত্যাদি নোংরা ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এছাড়া উল্লেখিত ২০টি জেলার এসকল ৭,৭০৫ জন শিক্ষকের শূন্যপদ এবং ২৪৪টি শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে। জেলার শিক্ষকদের মোট শূন্য পদ পূরণ করার পরও জেলায় মোট সৃষ্টপদের কমপক্ষে বাড়তি এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ সৃষ্টি প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। একইভাবে উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসে যে জনবল কাঠামো রয়েছে তা একেবারেই অপ্রতুল।

৩.১.১১ সুপারিশসমূহ

জেলা পর্যায়ে আয়োজিত সেমিনার এর মাধ্যমে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রী, ম্যানেজিং কমিটি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যেসকল সুপারিশগুলো পাওয়া গেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো -

- স্কুলের ক্যাচমেন্ট পুনঃনির্ধারণ করা দরকার। যাতে করে ভর্তিযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুলে যাতায়াত সহজ হয়।
- যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা মাদ্রাসা এবং এগুলোকে অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারকে আরো কঠোর হতে হবে।
- প্রত্যেকটি গ্রামে কমপক্ষে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করতে হবে।
- চরাঞ্চলের শিশুদের জন্য দুপুরের খাবার, উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ নতুন করে বিদ্যালয় নির্মাণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা যাতে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পাঠ্য বই পায় সেজন্য জানুয়ারি মাসেই সকল বিষয়ে নতুন বই পাঠানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- দুরত্ব অনুযায়ী উপজেলা থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত বই পরিবহনের ন্যায্য খরচ বইয়ের সাথে সাথে প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষার্থীদের আগাম বছরের চাহিদা নিরুপণ করে বর্তমান বছরের নভেম্বরের মধ্যেই তা সংশ্লিষ্টদের পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- বই বিতরণ ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার জন্য শিক্ষক ও এসএমসি'র মনিটরিং জোরদার করতে হবে।
- বই বিতরণের পূর্বেই কন্টিনজেন্সির টাকা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা যাতে শিক্ষকদের বই প্রদানের সাথে পরিবহন খরচের টাকা দেয়া সম্ভব হয়।
- মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা মনে করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ৩০ করা দরকার। এরজন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সকল শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল স্রোতধারার শিক্ষায় নিয়ে আসার জন্য প্রত্যেকটি স্কুলের সকল শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থ্যা করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটির ভূমিকা আরও সক্রিয় করতে হবে।
- এসএমসি সক্রিয় করার জন্য গঠন প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য করতে হবে।
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে
- পর্যাপ্ত ক্লাসরুম ও অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
- নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষকদের বদলি করতে হবে।

- অফিস সহকারী বা করণীক, ৪র্থ শ্রেণী কর্মী ও পরিচ্ছন্ন কর্মী, নৈশপ্রহরীর পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ দিতে হবে।
- স্কুলের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে ও পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।
- শিক্ষা ছাড়া শিক্ষকদের অন্য কাজে সম্পৃক্ত না করা এবং সময়মতো বেতন-ভাতা ও বিল প্রদান করতে হবে।
- শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে মানসম্মত বেতন স্কেল প্রদান করতে হবে।
- দরিদ্রতা হ্রাসে উপবৃত্তি কার্যক্রমের সাথে অন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- সকল দরিদ্রপ্রবণ এলাকায় মিড-ডে স্কুল মিল চালু করাসহ সকল বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করতে হবে।
- যোগ্য ও মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে ও শিক্ষকদের হোম ভিজিট বাড়াতে হবে।
- বিদ্যালয়ে নিয়মিত খেলাধুলাসহ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা এবং অন্য বিদ্যালয়ের সাথে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।
- বিদ্যালয়কে শিশুবান্ধব ও আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করা এবং পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- বিদ্যালয়ে শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ও বিনা মূল্যে ঔষধ প্রদান করতে হবে।
- গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে খাতা, কলম ও যাবতীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।
- পর্যাপ্ত খেলার উপকরণ সরবরাহসহ ক্রিড়া শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ প্রদান এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।

এছাড়া উপজেলা ও জেলা প্রাথামিক শিক্ষা অফিস থেকে প্রাপ্ত কিছু সুপারিশমালা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- শিক্ষক সংখ্যা ও স্কুল সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- সমহারে স্নাতক যোগ্যতা সম্পন্ন নারী-পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।
- প্রধান শিক্ষক পদকে ২য় শ্রেণীর সমান মর্যাদা এবং সিলেকশন গ্রেড দিতে হবে ও সহকারি ও প্রধান শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে। ক্রমান্বয়ে ওপরের পদগুলো বিন্যাস করতে হবে।
- জেলা ও উপজেলা অফিসগুলোতে লোকবল বৃদ্ধি এবং এ অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে ।
- বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করার কার্যক্রম নিতে হবে, যাতে কোন ছাত্র-ছাত্রী ঝরে না পড়ে।
- পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
- সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য যাতায়াত ভাতাসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।
- সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
- রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রাথামিক শিক্ষা প্রসাশন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।
- সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতার মনোভাব তৈরিতে কাজ করতে হবে।
- জনপ্রতিনিধিগণকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসতে হবে, প্রভাব বিস্তারের জন্য নয়।

উপসংহার

সুপ্র কর্তৃক সম্পাদিত সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিদ্যমান দুর্বলতাসমূহ খুঁজে বের করে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার উৎকর্ষতা এবং শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানোন্নয়নের উপায়সমূহের উপায় অনুসন্ধান করা পাশাপাশি বিদ্যমান সরকারি সেবা জনসচেতনতা তৈরিই সামাজিক নিরীক্ষার উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু সাফল্য অর্জন করলেও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়া ছাড়া তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয় নি। এখন পর্যন্ত একটি চূড়ান্ত স্বাস্থ্যনীতি প্রণীত হয় নি। সকলের জন্য বৈষম্যমুক্তভাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য চিকিৎসাসেবা পরিসর ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় যেমন: ভেজালমুক্ত ও পর্যাপ্ত পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য, নিরাপদ পানীয় জল, পর্যাপ্ত পয়ঃনিস্কাশণ সুবিধা, নিরাপদ আবাসন সুবিধা, স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা ও তথ্যে অভিগম্যতা ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণে সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন চাহিদাভিত্তিক, অর্জন উপযোগী ও বাস্তবমুখী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন, দুর্নীতি হ্রাস, কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। জোরদার করতে হবে পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা। কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারকে তথাকথিত আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর নির্দেশিত নীতি-কাঠামোর বাইরে স্বাধীন অবস্থান নিয়ে সার্বভৌম নীতি প্রণয়ন করতে হবে যাতে সকল দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পায়।